সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুঃষষ্টিতম বর্ষ ঃ ১ম ও ২য় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩৷১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

চতুঃষষ্টিতম বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বিষয়-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৪ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা

ব্রজের সখা ও সখীদের নামের ঐতিহ্য

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বহু পদে সুবল, ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি সখা ও সখীদের নাম দেখা যায়। এই নাম ও নামের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাব যদি শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সব পদ শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের সখা ও শ্রীরাধার সখীদের নাম ও কার্য্যকলাপের বিবরণ কোথায় কি ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩১-৩২) শ্রীকৃষ্ণের দশ জন সখার নাম পাওয়া যায়; যথা—স্তোককৃষ্ণ, অংশু, শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন্, দেবপ্রস্থ, এবং বরূথপ। শ্রীমদ্ভাগবতে সখাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোন বর্গীকরণ হয় নাই। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পৃঃ ৭২১, বহরমপুর-সং) তাঁহাদিগকে চারিটী বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ সুহৃৎ, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহারা বাৎসল্যগন্ধবিশিষ্ট সখ্যভাব পোষণ করেন। ইহাদের নাম সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, সোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের খুড়তুতো ও জেঠতুতো ভাই কুণ্ডল, দণ্ডী ও মণ্ডলকে ও বন গমনের সঙ্গী সুনন্দ, নন্দী ও আনন্দীকে এই পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা বয়সে ছোট ও দাস্যভাবমিশ্রিত সখ্যযুক্ত সখাশ্রেণীতে বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মন্দার, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধমকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় আর কয়েকটী অধিক নাম এই বর্গে আছে, যথা—মন্দর, চন্দন, কুন্দ, কলিন্দ, কুলিক। তৃতীয় বর্গে প্রিয়সখা—ইহাদের বয়স শ্রীকৃষ্ণের তুল্য এবং ভাব বিশুদ্ধ সখ্য। এই বর্গে আছেন শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রযোগ, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক। উক্ত গ্রন্থে শ্রীদামকে প্রিয়সখাদের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে (উত্তর, পঞ্চম, ১৭৩-৭৪) শ্রীদামকে শ্রীরাধার ভ্রাতা বলিয়াছেন এবং অন্যান্য সখার মধ্যে অংশুমান্ ও সুবলের নাম করিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতের উল্লেখ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পৃঃ ২১৯) আছে; সুতরাং ঐ গ্রন্থ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হয়। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরূপও উক্ত গণোদ্দেশে তাঁহাকে শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনাভ হইলেও শ্রীদাম শ্রীরূপের মতে শ্যামলরুচি; তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। শ্রীদাম "শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো

বাহুকেলিরসাকরঃ"। শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদী ও ললিতমাধবে শ্রীদামকে অবতীর্ণ করান নাই; কেবলমাত্র বিদগ্ধমাধব নাটকে এক স্থানে তাঁহাকে মধুমঙ্গলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত দেখা যায়। রঘুনাথদাস গোস্বামী দানকেলিচিন্তামণিতে (২০ শ্লোক) সনাতন ও রূপের অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীদামের অনুজা বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী গোপালচম্পূতে (পূর্ব্ব, ২১।২৬ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১০৮৪) বলিয়াছেন যে, "শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণিসংজ্ঞক চারি জন সখাকে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বহিঃস্থিত ও প্রকাশমান মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার বলিয়া সেই সেই নামে বিখ্যাত জানিতেন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ বর্গের সখাদিগকে শ্রীরূপ প্রিয়নর্ম্মসখারূপে অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহারা গোপন লীলার সহায়তায় নিযুক্ত। ইঁহাদের নাম সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত এবং উজ্জ্বল। ইঁহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল প্রধান। গণোদ্দেশে কোকিল, সনন্দন ও বিদগ্ধের নাম অতিরিক্ত আছে। উজ্জ্বলনীলমণিতেও (পৃঃ ৫৭) শ্রীদামকে নায়ক-তুল্য গুণবান্ পীঠমর্দ্দ শ্রেণীর ও সুবল ও অর্জ্জুনকে প্রিয়নর্ম্মসখার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সুবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপন-মধুর সম্বন্ধের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া শ্রীরূপ লিখিয়াছেন (উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৫৭) যে, স্মর-সমরে ক্লান্ত হইয়া মাধব যখন প্রেয়সীর বক্ষোপরি ন্যস্তাঙ্গ হন, তখন সুবল চামর লইয়া বাতাস করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় (পরিশিষ্ট, ৪৪) সুবলের বয়স সাড়ে বার বৎসর, তাহার বর্ণ গৌরকান্তি, তাহার কার্য্য—সখীভাব আশ্রয় করিয়া উভয়ের মিলন সাধন ও নানারূপ সেবা করা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

রঘুনাথদাস গোস্বামী দানকেলিচিন্তামণি নাটিকায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলাইয়াছেন (শ্লোক ৩৫), "সুবল, তুমি বিশাখাকে রুদ্ধ কর; উজ্জ্বল, তুমি চিত্রাকে ধর; বসন্ত, তুমি চম্পকলতা ও তুঙ্গবিদ্যাকে এবং কোকিল, ললিতাকে বেষ্টন কর।" উজ্জ্বল, বসন্ত ও কোকিল শ্রীরূপের মতে প্রিয়নর্ম্মসখা, যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহাদের নাম নাই। কবি-কর্ণপূর কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীর পূর্ব্বাহ্নলীলায় (শ্লোক ১৫) কেবলমাত্র ভাগবতে প্রদত্ত দশটী নামই দিয়াছেন—অন্য কোন নাম দেন নাই। রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি কোন সখারই নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যরূপে বিদূষক মধুমঙ্গলের মাত্র নাম লইয়াছেন। শ্রীরূপ রায় রামানন্দের নিকট হইতে এই মধুমঙ্গল নামটী ধার করিয়াছেন। দানকেলিকৌমুদী (পৃঃ ৫৬, বহরমপুর সং) ও বিদগ্ধমাধবে (পৃঃ ৪৪, ঐ) মধুমঙ্গলের চরিত্র তিনি বিদূষকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় মধুমঙ্গল ঈষৎ শ্যামলবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনির পুত্র, পৌর্ণমাসী দেবীর পৌত্র এবং নান্দীমুখীর ভ্রাতা।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত দশটী সখার মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীদাম ও সুবলের নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (পৃঃ ৫২৮, বাংলা) পাওয়া যায়। ঐ পুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য সখার নাম সুদাম,

বসুদাম, সুপার্শ্ব, শুভাঙ্গী, সুন্দর, চন্দ্রভান, বীরভান, সূর্য্যভান, বসুভান ও রত্নভান। সুদাম ও বসুদাম ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অন্য কোন নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৩৯ অধ্যায়, ২০ হইতে ২২ শ্লোক) শ্রীদাম, বসুদাম, সুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ ও অংশুভদ্র, শ্রীকৃষ্ণের এই ছয় জন সখার নাম আছে। ভাগবতের দশটী নামের মধ্যে শ্রীদাম ও স্তোককৃষ্ণের নাম মেলে; ভাগবতের অংশুকে অংশুভদ্ররূপে গ্রহণ করিলে তিনটী নামের মিল হয়। পদ্মপুরাণে সুবলের নামই নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সুবলের নাম থাকিলেও, তিনি ঐ দুই পুরাণে বর্ণিত অন্যান্য সখাদের মধ্যে একজন মাত্র। তাঁহাকে প্রিয়নর্ম্মসখা করার কৃতিত্ব শ্রীরূপ গোস্বামীরই। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদে যেখানে যেখানে সুবলের কথা আছে, সেখানে সেখানে তিনি অন্যান্য সখাদের মধ্যে একজন সখা নহেন, কিন্তু প্রাণের সখা, যাঁহার কাছে গোপনতম গুহ্যকথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে এবং যাঁহাকে প্রিয়ার সহিত মিলন ঘটাইতে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। দুই চারিটী উদাহরণ দিতেছি। পদকল্পতরুর ২১০ সংখ্যক পদে আছে—

সজনি, ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরি　　নবীন কিশোরি
নাহিতে দেখিলু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ　　সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনি মাজিছে গা।　ইত্যাদি

কয়েকখানি পুথিতে ঐ পদটীতে লোচনদাসের ভণিতা আছে। সুবলের নামও কয়েকখানি পুথিতে নাই। সুবলের নাম থাকিলে পদটী প্রাক্‌চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে না, এ সন্দেহ সে যুগেও জাগিয়াছিল। গোষ্ঠবিহারের একটি পদ লওয়া যাক—

ব্রজকুলবাল　　রাজপথে আইল
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ　　ভায়া বলরাম
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সঙ্গেতে　　তার কান্ধে হাত
আরোপি নাগররায়।
হাসিতে হাসিতে　　সঙ্কেতে বাঁশীতে
এ দুই আখর গায়॥
এ কথা আনেতে　　না পারে বুঝিতে
সুবল কিছু সে জানে॥

অন্যান্য সখার অপেক্ষা সুবল শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বিশ্বাসভাজন, ইহা এখানে দেখানো হইয়াছে। এ সুবল শ্রীরূপের পরবর্ত্তী। রসোদ্গারের একটি পদে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

আজুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি
করিল বিবিধ রসে।
রসের সাগরে ডুবাইল মোরে
বিহানে চলিল বাসে॥
শুন হে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী গুণের আগরি
পুন কি পাইব দেখা॥

এখানেও অন্যান্য সখা হইতে সুবলের বৈশিষ্ট্য দেখানো হইয়াছে। সুবল এখানে প্রিয়নর্ম্মসখা; সুতরাং শ্রীরূপের পরবর্ত্তী কালের।

এইবার ব্রজের সখীদের কথা আলোচনা করা যাউক। উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালিকা প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা (৩৫ শ্লোক, বহরমপুর সং, পৃঃ ৯৬)। সখীরূপে নহে, কৃষ্ণবল্লভারূপে বিশাখা, ললিতা, শ্যামা প্রভৃতির নাম কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তাহার প্রথম সন্ধান দিয়াছেন সনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকে বা ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে বৃহৎবৈষ্ণবতোষণীটীকায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই; তাঁহার কোন সখীরও নাম উহাতে পাওয়া যায় না। "অনয়ারাধিতো নূনম্‌" ইত্যাদি ১০।৩০।২৮ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধার নামের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু গোপীগীতের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন সহসা গোপীদের নিকট আবির্ভূত হইলেন, তখন কোন্‌ কোন্‌ গোপী কি ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার ব্যাখ্যা করিবার সময় ১০।৩২।৭ শ্লোকের টীকায় বলিলেন যে, "একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা" ইত্যাদি শ্লোকে যিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া প্রণয়কোপে বিহ্বলা হইয়া ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষপাতের দ্বারা যেন তাড়না করিতে লাগিলেন, তিনিই শ্রীরাধা, কেন না, এই গোপী পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠাযুক্তা। এক গোপী অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। পরের শ্লোকে আছে যে, কোনও গোপী নয়নরন্ধ্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া, যোগীর মতন নয়ন মুদ্রিত করিয়া রোমাঞ্চযুক্তা ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সনাতন গোস্বামী দশমের ৩২ অধ্যায়ে বর্ণিত কোন্‌ গোপী কে, তাহার নাম পুরাণাদি হইতে দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীরাধার নামের প্রমাণ দিতে যাইয়া তিনি প্রথমে ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডের মল্লদ্বাদশী প্রসঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরসংবাদ হইতে বলিলেন—

গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্যেন নিবোধ মে।
গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা॥
রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা॥

উদ্ধৃত শ্লোকে 'বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা' স্থলে 'বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা' পাঠও তিনি ধরিয়াছেন। বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী লেখার বহু পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি রচনা করেন; কেন না, সনাতন ঐ টীকাতেই লিখিয়াছেন—"বিবৃতং চৈতন্যদনুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগবতৈ-রুজ্জ্বলনীলমণেঃ স্থায়িভাববিবরণে। অতো গান্ধর্ব্বেতি যা গোপালতাপন্যাং প্রসিদ্ধা সাপি মুখ্যাত্বলিঙ্গেনেয়মেবেতি মন্যন্তে।" শ্রীরূপ ভবিষ্যপুরাণের উক্ত শ্লোকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তাই উজ্জ্বলনীলমণিতে (কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ, ৩৬) লিখিয়াছেন—

চন্দ্রাবল্যেব সোমাভা গান্ধর্ব্বা রাধিকৈব সা।
অনুরাধা তু ললিতা নৈতাস্তেনোদিতাঃ পৃথক্॥

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার মতের প্রতিধ্বনি করিয়া প্রীতিসন্দর্ভে (২৮৫ অনু) বলেন যে, অর্থসাম্যবশতঃ সোমাভা চন্দ্রাবলী বলিয়া অনুমিত হইতেছে—সোম অর্থে চন্দ্র, তাহার মত আভা বা কান্তি যাহার, অথবা চন্দ্রের আবলী, শ্রেণী অর্থাৎ চন্দ্রশ্রেণীস্বরূপা যিনি। ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকে গান্ধর্ব্বার নাম নাই, গোপালতাপনীর উত্তর বিভাগে ৯ ও ২৪ অনুচ্ছেদে গান্ধর্ব্বীর নাম আছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গোপালতাপনীর টীকায় লিখিয়াছেন যে, কোথাও গান্ধর্ব্বা পাঠও দেখা যায়। শ্রীরূপ ও সনাতন গান্ধর্ব্বা নামই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ গান্ধর্ব্বাই রাধা, ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকটী সনাতন গোস্বামীই প্রথম উদ্ধার করেন; পরে শ্রীজীব উজ্জ্বলনীলমণির লোচনরোচনী টীকায় (কৃষ্ণবল্লভা, ৩৫ টীকায়), প্রীতিসন্দর্ভে এবং রাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকাতে (হরিদাস দাস সং, পৃঃ ৪৭) উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গোপীদের নাম ব্যাপারে এই শ্লোকটী গোস্বামীদের প্রধান উপজীব্য। ভবিষ্যপুরাণ যুগে যুগে বর্দ্ধিত হয়, সেই জন্য ঐতিহাসিকদের নিকট ইহার ঐতিহাসিকতা খুব প্রবল নয়। যাহা হউক, শ্রীরূপ ভবিষ্যপুরাণের দশটী নামের মধ্যে স্পষ্টতঃ মাত্র তিনটী অর্থাৎ গোপালী, পালিকা ও বিশাখা গ্রহণ করিয়াছেন এবং আর দুইটী অর্থাৎ সোমাভাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া ও অনুরাধাকে ললিতারূপে অপ্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত গোপীদের নামের মধ্যে ধন্যা, ধ্যাননিষ্ঠিকা, তারকা ও দশমীর নাম নাই। সনাতন গোস্বামী বলেন যে, দশমী একটি স্বতন্ত্র নামও হইতে পারে অথবা নবমা 'তারকার' মতন দশমীর নামও তারা বা তারকা হইতে পারে।

উক্ত শ্লোকের (১০।৩২।৭) টীকায় সনাতন গোস্বামী গোপীদের নামের প্রমাণস্বরূপ স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডের দ্বারকামাহাত্ম্যের মায়াসর প্রস্তাব হইতে ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, বিশাখা, রাধা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রার নির্দ্দেশমূলক আটটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। রাসে অন্তর্দ্ধানের পর মিলনের মধুরলীলার শ্লোকের টীকায় উদ্ধবের প্রতি বিরহিণী গোপীদের উক্তি উদ্ধৃত করা শুধু অপ্রাসঙ্গিক নহে, পরন্তু রসভঙ্গকারী জানিয়াও সনাতন গোস্বামী এই দুঃখময় প্রস্তাব উত্থাপনে লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "কিন্ত্বত্যন্তদুঃখময়োক্তিত্বান্নৈতাদৃশরসাবসরে দৃশ্যানি কদাচিদ্বিচারাবসরে ত্বপেক্ষ্যাণীত্যনন্ত-

গতিকত্বেনৈব লিখ্যন্তে।" ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৬ ও ৪৭ অধ্যায়ে উদ্ধবের ব্রজে আগমন ও ভ্রমরগীতার অক্ষম অনুকরণে স্কন্দপুরাণে গোপীদের উক্তিগুলি লিখিত হইয়াছে। উদ্ধব যখন গোপীদিগকে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, তখন ললিতা ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়া উদ্ধবকে কহিলেন, —"তুমি অসভ্য, ভিন্নমর্য্যাদ, শঠ, ক্রূরজনপ্রিয়; আমাদের সামনে তুমি আর সেই অকৃতজ্ঞের কথা বলিও না।" শ্যামলা কহিল—"সখীগণ! সেই মন্দভাগ্য, অল্পপুণ্য, দুর্ম্মতি হরির কথা আর কহিও না। অন্য কথার অবতারণা কর" (ভাগবতের ১০।৪৭।১৭এর 'ভণ্যতামন্যবার্ত্তা'র প্রতিধ্বনি)। ধন্যা কহিল—"এই দুষ্ট জনের দুষ্ট দূতকে কে এখানে আনিল? যে পথে গেলে লোকে আর ফিরিয়া আসে না, এই পাপিষ্ঠ সেই পথে চলিয়া যাউক"। বিশাখা কহিল—"যাহার কুল, শীল, জন্ম, কর্ম্ম কিছুই জানা নাই, সেই পুরুষার্থহীন ব্যক্তির সঙ্গ নিরর্থক"। রাধা বলিলেন—"পূতনাবধে যাহার পাপ ভয় নাই, অবলাজন হননে তাহার আবার শঙ্কা কি?" শৈব্যা কহিল—"ওহে মহাভাগ! সত্য বল, যদুবর কি করিতেছেন; তিনি নগরের নারীদের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া আমাদের কথা কি আর স্মরণ করেন?" পদ্মা বলিল—"বল উদ্ধব, কবে সেই নাগরীজনবল্লভ অম্বুজাক্ষ এখানে আগমন করিবেন?" ভদ্রা কহিল—"হা কৃষ্ণ, হা গোপবর, হা গোপীজনবল্লভ, সংসার সাগর হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর।"

শ্লোক কয়টি স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডের দ্বারকা মাহাত্ম্যের বেঙ্কটেশ্বর-সংস্করণে (পৃঃ ২৯২) ও বঙ্গবাসী সংস্করণে (পৃঃ ৫২৯৫) খুঁজিয়া পাইয়াছি। সনাতন গোস্বামীর পাঠ মুদ্রিত পুরাণের পাঠ হইতে উৎকৃষ্টতর। উভয় সংস্করণের স্কন্দপুরাণেই ললিতার উক্তি—

অসত্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ ক্রূরঃ ক্রূরজনপ্রিয়ঃ।
ত্বং মা কৃথা নঃ পুরতঃ কথা তস্যাকৃতাত্মনঃ ॥২৫
ধিক্ ধিক্ পাপসমাচারো ধিগ্ ধিগ্ বৈ নিষ্ঠুরাশয়ঃ।
হিত্বা যঃ স্ত্রীজনং মূঢ়ো গতো দ্বারবতীং হরিঃ ॥২৬

সনাতন গোস্বামীর ধৃত পাঠ—

অসভ্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ শঠঃ ক্রূরজনপ্রিয়ঃ।
মা বৃথাঃ পুরতোঽস্মাকং কথাস্তস্যাকৃততাত্মনঃ ॥

তিনি 'ধিগ্ ধিক্' ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোক ধরেন নাই। 'অসত্য' স্থানে 'অসভ্য' ও 'ক্রূর' স্থানে 'শঠ' পাঠে অর্থের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। পুরাণের মুদ্রিত পাঠে বিশাখার উক্তি—

ন শীলং ন কুলং যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্।
তস্য স্ত্রীহননে সাধ্ব্যো জায়তে জন্ম কর্ম্ম চ ॥

সনাতন গোস্বামীর ধৃত পাঠ—

ন শীলং ন কুলং যস্য জ্ঞায়তে জন্ম কর্ম্ম চ।
হীনস্য পুরুষার্থেষু তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ॥

ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ হাজরার মতে স্কন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ড ৭০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল (Puranic Records পৃঃ ১৬৫)। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উক্ত শ্লোকগুলি সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলেও, সন্দেহ হয় যে, প্রথমে হয়ত উদ্ধব ও গোপীদের কথোপকথন ঐ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে, দ্বারকার নিকটবর্ত্তী গোপ্রচার তীর্থের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে সহসা প্রহ্লাদ বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে গোকুলে পাঠাইয়াছিলেন ; উদ্ধব গোপীদের দ্বারা তিরস্কৃত হইলেন ; তিনি তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া কৃষ্ণকে গোকুলে আনাইলেন ; কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া তত্ত্বজ্ঞান কহিলেন। গোপীরা তথাপি বলিলেন -"আমাদের হৃদয় হইতে মায়া দূর হইতেছে না।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"এই ময়তীর্থের সরোবরের দর্শন স্পর্শনে অশেষ বন্ধন অপগত হয় ; তোমরা এখানে স্নান কর, সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইবে।" তারপর মায়াসরোবরের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, বিশাখা, রাধা প্রভৃতির উক্তি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় ; সুতরাং ষোড়শ শতকের কিছু কাল পূর্ব্বে ঐ শ্লোকগুলি স্কন্দপুরাণে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডের প্রামাণ্য অপেক্ষা স্কন্দপুরাণের প্রামাণিকতা অধিক। তাহা সত্ত্বেও সনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী স্কন্দের প্রমাণ ভবিষ্যোত্তরের পরে দিয়াছেন দেখিয়া ঐ সন্দেহ আরও প্রবল হয়।

যাহা হউক, স্কন্দপুরাণে গোপীদের ঐ উক্তি হইতে দেখা যায় যে, শ্রীরাধার ন্যায় ললিতা, বিশাখা, ধন্যা, শ্যামলা প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণবল্লভা ; শ্রীরাধার সখী মাত্র নহেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের ১০।৩২।৭র টীকায় দেখাইয়াছেন যে রাসস্থলে শ্রীকৃষ্ণ সহসা পুনরাবির্ভূত হইলে যে সব গোপী ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন বা নিজেদের বুকের উপর তাঁহার পদযুগল রাখিয়াছিলেন তাঁহারা দক্ষিণাভাবাপন্না ; আর যিনি ভ্রূকুটি করিয়া নিজের অধর দংশন করিয়াছিলেন তিনি বামা না হইলেও মধ্যভাবাপন্না। সনাতন গোস্বামী বলেন যে, স্কন্দপুরাণের ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা খুব কোপ প্রকাশ করায় বামা ; শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করায় দক্ষিণা ; আর শ্রীরাধা এই দুই ভাবের মাঝামাঝি কথা—"পূতনাকে যে বধ করিতে পারিয়াছে তাহার পক্ষে আর অদর্শনের দ্বারা অবলা হননে শঙ্কা কি ?" এইরূপ বলায় মধ্যভাবাপন্না। সুতরাং সনাতন গোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এইরূপে প্রহ্লাদসংহিতা (স্কন্দপুরাণান্তর্গত) এবং ভাগবতের 'মধ্যাত্ব' বিষয়ে সমতা অর্থাৎ একই প্রকারের ভাব অঙ্কন রহিয়াছে।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও ষোলজন কৃষ্ণবল্লভার নাম পাওয়া যায় (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ৭০ অধ্যায়, পৃঃ ৫৮৭ ; বঙ্গবাসী সংস্করণ ৩৯ অধ্যায়, পৃঃ ৩৩৯ : শ্লোক ৪-৯)—রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, হরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা, চন্দ্রাবতী, চিত্ররেখা,

চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, মধুমতী ও চন্দ্ররেখা। যোগপীঠ বর্ণনা উপলক্ষ্যে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা "ঐ সিংহাসনের বহিঃপ্রদেশে স্বর্ণসিংহাসনাবৃত যোগপীঠে ললিতা প্রভৃতি প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেক অঙ্গ রসভাবপূর্ণ। রাধিকাই মূল প্রকৃতি, ললিতাদি ঐ মূল প্রকৃতির অংশস্বরূপ। ললিতাদেবী সম্মুখে আছেন, শ্যামলা বায়ু কোণে, উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা, ঈশান কোণে শ্রীহরিপ্রিয়া, পূর্ব্বে বিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা, নৈঋর্ত কোণে ভদ্রা যথাক্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। যোগপীঠের কেশরাগ্রে সুন্দরী চন্দ্রাবলী বিদ্যমানা আছেন। এই আটটি পবিত্রা প্রধানা কৃষ্ণবল্লভাই প্রকৃতি। রাধা আদ্যা ও প্রধানা প্রকৃতি।" গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালীতে দেখা যায় যে, যোগপীঠে ললিতাদির অবস্থান অন্যরূপ। ললিতা সম্মুখে না থাকিয়া উত্তরে, বিশাখা পূর্ব্বে না থাকিয়া ঈশান কোণে, চিত্রা পূর্ব্বকোণে, ইন্দুলেখা অগ্নিকোণে, দক্ষিণে চম্পকবল্লী, নৈঋর্তে রঙ্গদেবী, পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যা, বায়ুকোণে সুদেবী।

সা বৃন্দা যত্নতো ধ্যেয়া তত্রাদৌ ললিতোত্তরে।
ঐশান্যে তু বিশাখৈন্দ্রে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নয়ে॥
যাম্যে চম্পকবল্লী চ নৈঋর্তে রঙ্গদেবিকা।
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাথ সুদেবী বায়বে তথা॥

সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী পদ্মপুরাণের এই শ্লোকগুলি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করিলেন না কেন? তাঁহারা কেবলমাত্র ভবিষ্যোত্তর ও স্কন্দের প্রমাণেই সন্তুষ্ট রহিলেন কেন? শ্রীরূপনির্দ্দিষ্ট অষ্টসখীসম্বলিত যোগপীঠের সহিত পদ্মপুরাণের অষ্টকৃষ্ণবল্লভাযুক্ত যোগপীঠের বৈষম্য দেখিয়াই কি তাঁহারা ঐ শ্লোক উদ্ধার করেন নাই? অথবা ঐ শ্লোক কয়টি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মপুরাণের মধ্যে সন্নিবিষ্টই ছিল না? এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্কন্দপুরাণে লিখিত রাধা ছাড়া আর সাতটি গোপীর মধ্যে ললিতা, বিশাখা, শৈব্যা ও পদ্মা এই চারিটি নাম শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে কৃষ্ণবল্লভারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের ভদ্রা ও শ্যামলাকে যদি শ্রীরূপের ভদ্রিকা ও শ্যামার সহিত অভিন্ন মনে করা যায়, তাহা হইলে সংখ্যাটি চার স্থানে ছয় হয়। পদ্মপুরাণের উল্লিখিত ষোলটি নামের মধ্যে শ্রীরূপ ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা এই ছয়টি মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, দশটি নামকে তাঁহার কোন গ্রন্থে স্থান দেন নাই। উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে (পৃঃ ৯৬-৯৭, বহরমপুর সং)—

তত্র শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাস্তু রাধা চন্দ্রাবলী তথা।
বিশাখা ললিতা শ্যামা পদ্মা শৈব্যা চ ভদ্রিকা।
তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা পালিকাদয়ঃ॥

তের জনকে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা কৃষ্ণবল্লভা এবং খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী, কুঙ্কুমা প্রভৃতিকে লোকপ্রসিদ্ধা

কৃষ্ণবল্লভা বলা হইয়াছে। শ্রীরূপের মতে ইহাদের মধ্যে বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ছাড়া আর প্রত্যেকেরই শত শত যূথ আছে এবং এক একটি যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা আছেন। উক্ত প্রকরণের শেষে শ্রীরূপ লিখিতেছেন—

যূথাধিপাত্বেঽপ্যৌচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ।
স্বেষ্টরাধাদিভাবস্য লোভাৎ সখ্যরুচিং দধুঃ॥

ভবিষ্য, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ললিতা বিশাখার নাম কৃষ্ণবল্লভাদের মধ্যে দিয়াও শ্রীরূপ তাঁহাদিগকে সখী হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। ললিতা, বিশাখার নাম পুরাণে থাকিলেও, শ্রীরূপই ইহাদিগকে শ্রীরাধার পরমশ্রেষ্ঠ সখীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সখাদের ন্যায় সখীদিগকেও শ্রীরূপ সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী এই পাঁচ বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠা, প্রভৃতি সখী; কস্তুরিকা, মণিমঞ্জরিকা ইত্যাদি নিত্যসখী; শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী; কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী; এবং ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী, এই আটজন পরমপ্রেষ্ঠ সখী।

সখীর সহিত নায়িকার পার্থক্য কোথায় তাহা শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণির সখী প্রকরণে (৩৬) উদাহরণের সহিত দেখাইয়াছেন। সখীর নিজের কৃষ্ণসঙ্গমে রুচি নাই; শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সাধন করিয়াই তিনি কৃতার্থা হন। "সখ্যেনৈব সদা প্রীতা নায়িকাত্বানপেক্ষিণী।" শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে সুখ অনুভব করেন, তাহা নিজ সুখ অপেক্ষা সখী অধিক বলিয়া মনে করেন। ইহার ভাব লইয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় ললিতাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে লিখিয়াছেন—শ্রীরাধা ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের সঙ্গমে রঙ্গচর্য্যা যাঁহার প্রেষ্ঠকার্য, এবং অন্যান্য সকল উৎসব অপেক্ষা এই বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা সেই গোকুলের প্রিয়সখীদের প্রধানতমা ও সকল গুণে সুললিতা ললিতাদেবীকে প্রণাম করি। রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় (১২৭ শ্লোক) শ্রীরূপ তাঁহাকে সকল সখীর অধ্যক্ষা এবং প্রেমবিষয়ে সন্ধিবিগ্রহকারিণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকে ও অন্যান্য রচনায় ললিতা ও বিশাখাকে শ্রীরাধার সখী ও পদ্মা শৈব্যাকে চন্দ্রাবলীর সখীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও স্কন্দ পদ্মাদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপীর বল্লভ; আর শ্রীরূপ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রধানতঃ রাধা ও চন্দ্রাবলীর বল্লভ—যদিও অন্যান্য বল্লভাও তাঁহার গৌণরূপে বর্ত্তমান। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্কন্দাদি পুরাণে এবং শ্রীরূপের গ্রন্থাদিতে ললিতা বিশাখা নাম

এক হইলেও, তাহাদের ভাব, কার্য্য ও চরিত্র পৃথক্। পদাবলী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অন্যান্য সাহিত্যে ললিতা বিশাখা কোথাও কৃষ্ণবল্লভারূপে অঙ্কিত হন নাই; সর্ব্বত্র সখীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সখীদের অধ্যক্ষা রূপিণী ললিতা শ্রীরূপেরই সৃষ্টি।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে সখীর কথা বহুস্থানে থাকিলেও কোথাও সখীর নাম নাই। শ্রীরূপের গ্রন্থাদি রচনার কিছু পূর্ব্বে রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ নাটক রচনা করেন। তিনি একদিকে যেমন পরম পণ্ডিত অন্যদিকে তেমনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ও শিষ্য। শ্রীরূপের গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে সখী হিসাবে ললিতা বিশাখাদির শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি থাকিলে রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ নাটকে এই দুই নামই শ্রীরাধার সখীরূপে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি ঐ নাটকে সখী হিসাবে শশিমুখী, মদনিকা, অশোকমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী ও মাধবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন—ললিতা বিশাখার নাম করেন নাই। রায় রামানন্দ এই নামগুলি কি কোন পুরাণ বা তন্ত্র হইতে লইয়াছেন অথবা নিজে দিয়াছেন?

ইহা বিচার করিবার জন্য প্রাচীন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে যে সমস্ত গোপীর নাম পাওয়া যায়, তাহা অকারাদি অক্ষর অনুসারে সাজাইয়া লিখিতেছি, যাহাতে ভবিষ্যৎ গবেষকেরা সহজেই কোন গোপী বা সখীর নামের ঐতিহ্য খুঁজিয়া পাইতে পারেন। প্রথমে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৪৩ অধ্যায়ে) যে নামগুলি দেখা যায় তাহা আভিধানিক রীতিতে সাজাইয়া লিখিতেছি—(যেগুলি ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও পাওয়া যায় তাহাদের পাশে ছোট বন্ধনীতে 'ব্র' এবং যেগুলি স্কন্দ পুরাণেও পাওয়া যায় তাহাদের পাশে 'স্ক' দিতেছি), অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমালিনী, অনঙ্গসেনা, অপর্ণা (ব্র), অশ্রুতা, আকল্পা, উগ্রতপা, উদ্‌গীতা, উর্ব্বশী, কলকণ্ঠিকা (শ্রীরূপে কলকণ্ঠী), কলগীতা, কলাবতী, কস্তুরী (শ্রীরূপে কস্তুরিকা), কান্তি, কামকলা, কামদায়িনী, কাঞ্চনমালা, কুমুদ্বতী, কৃষ্ণপ্রিয়া (ব্র), ক্রমপদা, ক্রিয়াবতী, গুণবতী, চন্দ্রকলা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রমালা, চন্দ্ররেখা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রিকা, চিত্রবৃন্দাবনা, চিত্ররেখা, তারামালিনী, ধন্যা, ধাত্রী, ধারিণী, নবমল্লিকা, নবমল্লী, নিত্যানন্দা, পদ্মা, পদ্মিণী, প্রিয়ব্রতা, প্রিয়মুদা, পূর্ণরসা, বর্ণপ্রভা, বর্ণাবলী, বর্ণমালা, বহুকলা, বহুগুণা, বহুপ্রদা, বহুপ্রয়োগা, বহুহূতা, বালাসুরা, বাসন্তী, বিপঞ্চী, বিশ্বমাতা, বিশাখা, ভদ্রা, ভোগদা, মদনমঞ্জরী, মদনসুন্দরী, মদয়ন্তী, মধুমতী, মণিগ্রীবা, মণিপ্রভা, মণিমালিকা, মল্লী (শ্রীরূপের রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় পুলিন্দকন্যা), মালতী, যূথী, রতলোলা, রত্নমালিকা, রত্নরেখা, রতিকলা, রতি-চিন্তামণি, রতিসুখদায়িনী, রতোৎসুকা, রম্ভা, রসকল্লোলিনী, রসতরঙ্গিনী, রসপীযূষধারা, রসবল্লরী, রসবাপিকা, রসবিহ্বলা, রসমন্থরা, রসলয়া, শতসন্ততিকা, শেফালিকা, সুকল্পা, সুদতী, সুপর্ণা, সুপর্ব্বা, সুপ্রভা, সুব্রতা, সুমনা, সুমেধা, সুরেখা, সুলোচনা, সুশীলা, সৌকলিনী, সৌগন্ধিকা, সৌদামিনী, স্বর্ণরেখিকা, হারাবলী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড-বঙ্গবাসী সং, অধ্যায় ৪, ২৮, ৯৪ ও ১২৬ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণ ২৭ অধ্যায়, পৃঃ ৫৭৭) গোপীদের নাম—অপর্ণা, (পদ্ম), অম্বিকা, কদম্বমালিকা, কালিকা, কুন্তী, কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণপ্রিয়া (পদ্ম), গঙ্গা, গোপী, গৌরী, চন্দন-

নন্দিনী, চন্দনা, চন্দ্রমুখী, চম্পা, চম্পাবতী, চম্পিকা, জাহ্নবী, দুর্গা, নন্দনা, নন্দিনী, পদ্মমুখী, পদ্মাবতী, পারিজাতা, মধুমতী (পদ্ম), যমুনা, রত্নমালা, রতি, শুভা, সতী, সরস্বতী, সর্ব্বমঙ্গলা, স্বয়ংপ্রভা, সাবিত্রী, সুধামুখী, সুন্দরী, সুশীলা। ইঁহারা সখী, কেন না বঙ্গবাসী সংস্করণের ২৬ অধ্যায়ে দেখা যায় যে রাধিকা বলিতেছেন, 'তোমরা বল্লভকে বাঁধিয়া আন'। ৯৪ অধ্যায়ে উদ্ধবসংবাদে সখীদের মধ্যে প্রধানাদের নাম—মাধবী, মালতী, পদ্মাবতী, চন্দ্রমুখী, শশিকলা, সুশীলা, রত্নমালা ও পারিজাতা (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, পৃঃ ৮০১)। ললিতা বিশাখা সখীরূপে প্রসিদ্ধা হইলে তাঁহাদের নাম এখানে থাকিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসারে (২৮ অধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড) ২৮ জন গোপী স্ব স্ব যূথসহ রাসে গিয়াছিলেন। উঁহাদের নামও পূর্ব্বপ্রদত্ত শ্রীরাধার ৩৩ জন সখীর মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং উঁহারা সখীও বটে, কৃষ্ণবল্লভাও বটে।

রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় (পৃঃ ২৪৬) শ্রীরূপ সম্মোহনতন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত ষোলটি সখীর নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন—কলাবতী, কৌমুদী, গৌরী, চন্দ্রিকা, নন্দা, বিজয়া, বিশাখা, মাধবী, মাধ্বী, রসবতী, ললিতা, লীলাবতী, শ্রীমতী, সাধিকা, সারদা ও সুধামুখী। ইহার মধ্যে শ্রীরূপ কোন্ কোন্ নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত ৬৪ জন সখী, ৮ জন বরযূথের সখী ও ৮ জন বরিষ্ঠযূথের সখীর নাম আভিধানিক রীতিতে সাজাইয়া দেখাইতেছি—ছোট বন্ধনীর মধ্যে স্কন্দ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, সম্মোহনতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া শ্রীরূপের কোন্ কোন্ নামের সহিত পূর্ব্বপ্রদত্ত নামের সাম্য আছে তাহা দেখাইব।

অনঙ্গমঞ্জরী, ইন্দুলেখা, কন্দর্পমঞ্জরী, কন্দর্পসুন্দরী, কমলা, কলকণ্ঠী (পদ্ম), কলহংসা, কলাপিনী, কলাবতী (স, পদ্ম), কাবেরী, কামনগরী, কামলতা, কুরঙ্গাক্ষী, গুণচূড়া, চিত্ররেখা (পদ্ম), চিত্রা, চন্দ্ররেখা (পদ্ম), চন্দ্রিকা (স, পদ্ম), চন্দ্রতিলকা, চপলা, চম্পকলতা, চারুকবরী, তনুমধ্যা, তিলকিনী, তুঙ্গবিদ্যা, তুঙ্গভদ্রা, দাম্নী, ধনিষ্ঠা, নাগরী, নাগবেণী, পঙ্কজাক্ষী, প্রেমমঞ্জরা, ফুল্লকলিকা, বঙ্গবাটী, বরাঙ্গদা, বিচিত্রাঙ্গী, বিশাখা (স, প), মঞ্জরী, মঞ্জুকেশী, মঞ্জুমেধী, মদনালসা, মধুরেক্ষণা, মধুবিন্দিরা, মধুস্পন্দা, মনোহরা, মাধবী (স, ব্র), মানকুণ্ডলা, মালতী (ব্র, প), মোদনী, রঙ্গদেবী, রতিকলা (প), রতিকা, রত্নপ্রভা, রত্নলেখা, রসালিকা, রসোত্তুঙ্গা, রামিণী, ললিতা (স, স্ক, প), শশিকলা (ব্র), শিখাবতী, শুভাঙ্গদা, শুভাননা, শৌরসেনী, সুকেশী, সুগন্ধিকা, সুচরিতা, সুভদ্রা, সুদেবী, সুমধুরা, সুমধ্যা, সুমন্দিরা, সুমুখী, সুরভি, সুসঙ্গতা, হারকণ্ঠী, হারহীরা, হরিণী ও হিরণ্যাঙ্গী। এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে, উল্লিখিত ৭২টি নামের মধ্যে শ্রীরূপের পূর্ব্বে কেবলমাত্র ১১টি নাম অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ নাম কোন পুরাণ বা তন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর শতকরা ৮৫ ভাগ নাম স্বয়ং শ্রীরূপের দ্বারা উদ্ভাবিত।

রূপ, সনাতন, শ্রীজীবের সময় কৃষ্ণযামলতন্ত্র প্রচলিত ছিল কি না, থাকিলেও উহাতে আশীজন মুনি ও চল্লিশজন শ্রুতি, যাঁহারা পরে গোপী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল কি না জানা যায় না। কিন্তু উঁহারা কোথাও কৃষ্ণযামলের গোপীদের নামের উল্লেখ করেন নাই। কিশোরপ্রসাদ বিশুদ্ধরসদীপিকা নামক ভাগবতের টীকায় (১০।২৯।১) ঐ

সব নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। আভিধানিক রীতিতে উহা নিম্নে লিখিতেছি। নামের সংখ্যা ১২০-এর পরিবর্ত্তে ১১৩ হইয়াছে, কেননা একই নাম একাধিকবার কৃষ্ণযামলে লিখিত হইয়াছে।

অমৃতপ্রিয়া, অমৃতা, অমৃতানন্দা, উগ্রতপা (পদ্ম), উদ্‌গীতা (পদ্ম), কমলাবতী, কলকণ্ঠী, (পদ্ম, রূপ), কলগীতা (পদ্ম), কলস্বনা, কলাবতী (পদ্ম), কলোত্তমা, কস্তূরী (পদ্ম), কাঞ্চনমালিনী (পদ্ম), কামনীয়া, কামাচারা, কামিনী, কাম্যা, কালিকা (ব্রহ্ম), কুমুদ্বতী (পদ্ম), কুমুদা, কুশলা, কৃপা, কৌলিনী, গুণবতী, চারুসর্ব্বাঙ্গী, চিত্রকলা, চিত্রগন্ধা, চিত্ররূপা, জগন্মোহনসুন্দরী, জয়না, জয়ন্তী, জাতী, ধন্যা (স্কন্দ), ধরিত্রী, ধীরা, ধ্রুবা, ধৃতি, নন্দনী, নীলদীপ্তি, লীলাবতী, পদ্মিনী (পদ্ম), পরিমলা, প্রভা, প্রিয়ম্বদা, বকুলা, বহুক্রিয়া, বহুদা, বহুভোগা, বহুহূতা, বহুস্রবা, বিধুরা, বিধুরাঙ্গিকা, বিপুলা, বিপ্রয়োগা, বিশ্রামধারিণী, ভৃঙ্গী, মঙ্গলা, মদনপ্রিয়া, মদনা, মধুপ্রিয়া, মধুরা, মধুস্রবা, মহিলা, মাতঙ্গী, মালিনী, মৃদুলা, মেঘা, মেধ্যা, মৌঞ্জী, রসালা, রঙ্গবল্লী, রত্নকলা, রত্নচূড়া, রত্নরেখা (পদ্ম), রত্না, রুক্মমালা, রুচিরা, রসালা, হারাবলী, হরিবল্লভা, শচী, শারদা, শুচিশ্রবা, শুভা (ব্রহ্ম), শুভ্রা, শোভনা, শোভা, সতী (ব্রহ্ম), সনাতনী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সারঙ্গী, সিদ্ধি, সুখদা, সুখোৎপন্না, সুগন্ধা, সুগীতা, সুতপা, সুধাধারা, সুন্দরী (ব্রহ্ম), সুনাসিকা, সুপর্য্যায়া, সুপ্রয়োগা, সুফলিনী, সুবর্চ্চা, সুব্রতা, সুভ্রূবা, সুমুখী, সুমেধা, সুরভি, সুরেখা, সুলক্ষণা, সুলোচনা, সুশীলা (ব্রহ্ম), ক্ষান্তি। এই নামগুলির মধ্যে একমাত্র কলকণ্ঠী নামটি শ্রীরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীরূপের মতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াদের সংখ্যা দশ কোটি এবং নিয়তকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণসেবায় আসক্তা সখীদের সংখ্যা আট লক্ষ (রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ২৩২ শ্লোক)। শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকায় (পৃ. ৪৭, হরিদাস দাস সংস্করণ, ৪৫৭ গৌরাঙ্গ) বলেন যে গোপীদের সংখ্যা শতকোটি।

শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে কয়েকটি গোপীর নাম শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও কয়েকটি নাম লোক-প্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। কয়েকটি সখা সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও (পৃ. ৭৩৩) "এতেষু কেঽপি শাস্ত্রেষু কেঽপি লোকেষু বিশ্রুতাঃ" বলিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার মূলগ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—

লুপ্তমাসীৎ কৃপয়া জ্যোতির্ঘটয়েব ভানুমত্যাসৌ।
রূপবিষয়া দৃষ্টিঃ সরসান্ শব্দানবৈক্ষিষ্ট॥

কালরূপ অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গের নাম লুপ্ত হইয়াছিল, রূপের দৃষ্টি ভগবৎকৃপারূপ জ্যোতির্ঘটা দ্বারা ভানুমতী হইয়া সরস শব্দগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছে। দীনতার অবতার শ্রীরূপের এই মৌলিকতার দাবীর পর আর কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরূপের সৃষ্ট যে ললিতা বিশাখা, তাঁহাদের বিশদ বিবরণ তিনিই উক্ত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। ললিতা বয়সে শ্রীরাধা হইতে সাতাশ দিনের বড়। তাঁহার পিতার নাম বিশোক,

মাতার নাম বিশারদী, পতির নাম ভৈরব। বাম্য তাঁহার স্বভাব; তিনি প্রখরা। তিনি ময়ূরের পেখমের রংয়ের শাড়ী পরিতে ভালবাসেন। বিশাখা বিদ্যুদ্‌বর্ণা ইঁহার জন্ম রাধিকার জন্মদিনেই। বিশাখার পিতার নাম পারল, মাতার নাম দক্ষিণা; জটিলা দক্ষিণার মাসী। বিশাখাও বিবাহিতা, তাঁহার পতির নাম বাহিক। ইনি তারাবলী-বসনা। স্বভাবে ইনি রাধিকার ন্যায়ই না দক্ষিণা না বামা অর্থাৎ মধ্যা। বাংলার পদাবলীসাহিত্যে এই ললিতা-বিশাখার কথাই আছে; স্কন্দপুরাণাদির কৃষ্ণবল্লভার কথা নাই।

বেথুন সোসাইটি—৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটি ১৮৬০-৬১ সনে নূতন ভাবে কার্য্য সুরু করিয়া দিল। সোসাইটির কার্য্য ছয়টি বিভাগে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি বিভাগের ভার উৎসাহী সুবিজ্ঞ সদস্যগণ গ্রহণ করেন। প্রতিটি বিভাগের এক একজন করিয়া সভাপতি ও সম্পাদক। সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় সভাপতি ও সম্পাদকগণকে লইয়া সোসাইটির অধ্যক্ষ সভা গঠিত হইতে থাকে। ১৮৬০-৬১ সনেই প্রায় প্রতিটি বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার কতকটা পরিচয় আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছি। নবেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন ও বিভাগীয় সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হইত।

সোসাইটির ১৮৬১-৬২ সনের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৬১, ১৪ই নবেম্বর তারিখে। সভাপতি আলেকজাণ্ডার ডাফ সোসাইটির এক খণ্ড 'ট্রান্‌জ্যাকশন্‌স্' প্রকাশের সংবাদ এই সভায় বিজ্ঞাপিত করেন। ছয়টি মাসিক অধিবেশনে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দান করিবেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা এবারে সভাপতির পক্ষে বিজ্ঞাপিত করা সম্ভব হয় নাই। তবে চারটি বক্তৃতার বিষয় তিনি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই চারিটির বিষয় ও লেখক বা বক্তা এই :

1. The Physical History and Phylosophy of Irrigation
   —By Colonel Baird Smith
2. The Origin and Affinity of the Indian Vernacular
   —By Rajendra Lal Mitra
3, The Java and the Javanese
   —By Colonel Yule
4. The History and Economic Uses and Prospects of Indian Cotton
   —By Nobin Kristo Bose

সভাপতি বলেন যে, অপর দুইটি বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। এই সকল মাসিক অধিবেশনে বিভাগীয় সভা ও কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইত। যথাস্থানে আমরা এ কথা জানিতে পারিব। কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথের সেচ-বিষয়ক বক্তৃতা ১৪ই নবেম্বর তারিখের অধিবেশনেই প্রদত্ত হয়। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক জলপ্রণালী নদ-নদী খাল বিল—স্বাভাবিক অবস্থান, উৎপত্তি, প্রসার ও গতি সম্পর্কে তিনি এই রচনায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। স্বাভাবিক ও আকস্মিক কারণে নদনদীর উৎপত্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মানুষ নানা কৌশলে জল-প্রণালী সৃষ্টি করিতে এবং উহার গতি নিয়ন্ত্রণ ও

প্রসার সাধনে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির পক্ষে বিভিন্ন ধরণের সেচ-ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগ। আবার এ দেশের আর্থিক উন্নয়নেও উন্নত সেচ-ব্যবস্থার একান্ত আবশ্যক। কর্নেল স্মিথ ভারতীয় ইতিহাসে নৈসর্গিক ও প্রাকৃত সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রতিপাদন করেন। ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতি প্রচেষ্টায় এতাদৃশ সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্বও ইহাতে নির্দ্দেশিত হয়। বেথুন সোসাইটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রাজা কালীকৃষ্ণ প্রবন্ধোক্ত বিষয়াদির সমর্থনে বাংলা ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেচ-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে নদ-নদীর উপকারিতা এবং বিভিন্ন রাজার আমলে সেচ-ব্যবস্থা কি ভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে উদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যা করেন। জল-শক্তি সম্বন্ধেও যে প্রাচীনেরা অবগত ছিলেন কোন কোন পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তিনি তাহা বুঝাইয়া দেন।

এই বৎসর ২৮শে নবেম্বর দিবসে সোসাইটি 'শিক্ষা' বিভাগের এক সাধারণ অধিবেশন হইল। বিভাগীয় সভাপতি হেনরি উড্রো বলেন যে, পূর্ব্ব বৎসরে প্রায় কুড়িটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস রচনার প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন লেখকের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু মাত্র তিনটি সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ পাইয়াছেন। এবারে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'হুগলী কলেজের ইতিবৃত্ত' রচনা করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। উড্রো ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী দপ্তর হইতে বহু তথ্যপূর্ণ উদ্ধৃতি সংকলন করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। এই সংকলনটি 'ট্রান্‌জ্যাকশন'-এ সন্নিবেশিত হয়। এখনও শিক্ষা-গবেষকদের ইহা বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। উড্রোর একটি উপদেশে শিক্ষিত বাঙালীরা সবিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনিই প্রথম তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বঙ্গ-সন্তানদের উপস্থিত হওয়া বিধেয়। তাঁহারা যদি কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিলাতে ঐ উদ্দেশ্যে যান, তাহা হইলে তাঁহারা যে উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বক্তৃতা প্রদানের অন্ততঃ ছয় মাসের মধ্যেই দুই জন বঙ্গসন্তান—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাই হইতে একজন প্রার্থী দুই বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

বেথুন সোসাইটির দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হয় ১২ই ডিসেম্বর ১৮৬১ দিবসে। ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাংলার বাহিরে যাওয়ায় এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন এইচ. স্কট. স্মিথ। এই দিনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। রাজেন্দ্রলাল পরবর্ত্তী যুগে প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ও ভাষাতাত্ত্বিকরূপে সুধীসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে বাংলার প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ হিসাবেও গণ্য হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি ও নৈকট্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া

স্বভাবতঃই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেন। সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ত্বকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ বিষয়ে বান্‌সন, হামবোল্ট, বপ্, গ্রেমিন, শ্লেগেল, বুরনফ প্রমুখ পণ্ডিতগণের কৃতির কথা রাজেন্দ্রলাল অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তির আলোচনায় সংস্কৃত-ভাষীদের মূল অবস্থান, প্রসার ও উন্নতির সূত্রসমূহ আমরা অবগত হইতে পারি। মধ্য এশিয়া হইতে আর্য্যগণ দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়েন। ভারতবর্ষ, ইরাণ, রাশিয়া, জার্ম্মানী, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি বহুবিস্তৃত দেশসমূহের জাতিবর্গ একই আর্য্যগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত এবং তাহাদের নিজ নিজ ভাষার মূলেও রহিয়াছে একই ভাষা। ঋগ্‌বেদ যুগের সংস্কৃতের মূল খুঁজিবার কালে পণ্ডিতগণের নিকট এই সত্যই প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অনুশীলনের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৃহত্তম অঞ্চলের ভাষাসমূহ এদেশের পুরাতন সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর এক বিপুল অংশের অধিবাসীদের নৈকট্য সম্বন্ধেও আমরা অবগত হইয়া থাকি। বক্তৃতার উপসংহারে রাজেন্দ্রলাল এইরূপ কথা বলেন :

> "From what has been said I trust I have been able to show that the different vernaculars of Hindusthan proper from Chittagonj to the Indus and from the Himalaya to the Kristna are derived from the Sanscrit and if this be admitted it would follow on the most positive testimony—the irrifragable evidence of language—that the Anglo-Saxsion and the Hindu, the conquror and the conqured are alike descended from one common source. The Aryans whether blanched and invigorated in the regions of the North, or darkened and enervated in the torrid zone are the same ; all the descendants of one family and everywhere the representatives of a common race. They have become the rulers of history and it seemed to be the mission to link all parts of the world together by the chains of civilisation, commerce and religion. May they everywhere live in peace and brotherhood.

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা পণ্ডিত সমাজের ধারণা জন্মিয়াছে যে, পৃথিবীর এক বিরাট অংশের জাতিগত মিল রহিয়াছে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়াছে—কেউ সবল দুর্জ্জয় আবার কেউ বা দুর্ব্বল ও নিরীহ। রাজেন্দ্রলাল দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বিজয়ী ইংরেজ ও বিদিত ভারতবাসী একই আর্য্য গোষ্ঠী সম্ভূত। একই গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা সভ্যতা, বাণিজ্য এবং ধর্ম্মবোধের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জগতে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। রাজেন্দ্রলাল এই আশা পোষণ করেন। এই অধিবেশনে সোসাইটির প্রবীণ সদস্য নবীনকৃষ্ণ বসু বক্তৃতাটির খুবই প্রশংসা করেন।

সোসাইটির তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী ডক্টর ডাফের সভাপতিত্বে। তিনি অনেকটা নিরাময় হইয়া ইতিমধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া ছিলেন। তিনি ঐ সময় ছোটনাগপুরে কাটান। এ অঞ্চলের তখন কর্ত্তা ছিলেন মেজর ডালটন। ডালটন নৃতত্ত্ববিদ্ রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে মেজর ডালটন কিরূপ নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন ডাফ-প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম হইতে তাহা বুঝা যায়। ডাফ বলেন, মেজর ডালটন আচার-আচরণ এবং সহৃদয়তাপূর্ণ শাসনপদ্ধতি দ্বারা আদিবাসীদের মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতে তৎপর হইয়াছেন এবং তাহা দ্বারা শাসক-শাসিত উভয় শ্রেণীরই যথেষ্ট হিতসাধন সম্ভবপর হইবে। সোসাইটির সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র এই সময় অসুস্থতা নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সভাপতি ডাফ সভায় তাঁহার কৃত কর্ম্মের, বিশেষতঃ সোসাইটির সেবায় তাঁহার তৎপরতার, বিশেষ প্রশংসা করেন। ভারতবর্ষে আগমনের অব্যবহিত পরেই তিনি রামচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতিই ঘটিয়াছে এবং তিনি নিয়ত তাঁহার গুণাবলী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইয়াছেন। সোসাইটির সংরক্ষণ ও উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বজনবিদিত। সভাপতি ডাফ এ বৎসরের প্রথম বক্তা কর্ণেল বেয়ার্ড-স্মিথের আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। এই অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই।

জানুয়ারী মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে 'সাহিত্য ও দর্শন' বিভাগের অধিবেশন হয়। বিভাগীয় সভাপতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাউয়েল এ বিভাগের কার্য্যকলাপের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশীয় নাটক সম্পর্কীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের উল্লেখ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাধবাচার্য্য-বিরচিত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' শীর্ষক বিখ্যাত পুস্তকখানির অনুবাদ এই বিভাগের আনুকূল্যে সংসাধিত হয়। ইউরোপে যখন পেট্রার্কও বোকাসিওর অভ্যুদয়, ভারতবর্ষে তখন মাধবাচার্য্য আবির্ভূত হন। ইঁহারা প্রত্যেকেই তখন জ্ঞানের আলো নব নব রূপে বিকিরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন।

সোসাইটির চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৬২, ১৩ই ফেব্রুয়ারি। প্রথমেই কর্ণেল ইউল "Java and the Javanese" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। জাভার অবস্থান, ঐতিহ্য, ভাষা প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিয়া, জাভা বা যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। ইহার সপক্ষে নানা প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া উপসংহারে তিনি বলেন :

> "Here I must conclude ; and as I do so my thoughts recur to that part of my subject which in my judgment at least has the higher charm for the imagination, the deep print of Indian influence in this great and remote island. Not remote to our steamers ; but when the influence was impressed, as remote from India as South America is now from England. And was that influence confined to Java ?

On the contrary its foot-marks are found in all the other great islands, Sumatra, Borneo, Celebes, in Burma and Siam, in the world of China, in those glorious islands of far Japan which are just re-opening to our knowledge after centuries of seclusion ; and traces of Indian language are found, some think, even in the distant island of Polynesia. Where is now there any such expansion of Indian influence ? Is it not the case that the life of the ancient civilisation which once so spread its vigorous embraces from the Caspian to the Pacific is gone, and has been for a thousand years, effete and exhausted ? Has a nation even a second chance then ? Will India come to life again ? Will cotton and steam and a varnish of European science work that miracle ? I for one doubt it surely. We must look to a more living spring for a revival urnost of a nation's life.

যবদ্বীপ ও যবদ্বীপবাসীদের উপর ভারতবর্ষের প্রভাবের কথা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে কর্নেল ইউল বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, শুধু যবদ্বীপই নয়, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, পলিনেসিয়া, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন এবং জাপান দ্বীপাবলীতেও এই প্রভাব সুস্পষ্ট। ভাষার ভিতরে এবং অন্যান্য নিদর্শন দৃষ্টে তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। হাজার দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সমকালীন লোকেরা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার মঙ্গল স্পর্শে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়া পূর্ব্বশক্তি প্রাপ্ত হইবে। কলিকাতাস্থ 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র মারফত বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণার ফল—পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ এসিয়ার দেশসমূহের উপরে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এমন কি, ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রভাবের কথা—আমরা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছি। কর্নেল ইউল এই সকল গবেষণার পথিকৃৎরূপে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার জন্য রমানাথ ঠাকুর বক্তাকে আন্তরিক সাধুবাদ করেন। পাদ্রী লঙ বলেন, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে তিনি বৌদ্ধ-সংস্কৃতিবিষয়ক কতকগুলি নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন এবং এ সমুদয় সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইবেন। সভাপতি পাদ্রী লঙের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, তিনি সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিলেও কিছুকাল পরে অবশ্য এ দেশে ফিরিয়া আসিবেন। সমাজবিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতিরূপে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বঙ্গদেশের সমাজ সম্পর্কে লঙ্ পাঁচ শত প্রশ্ন করিয়া, সভ্য ও অন্যান্যের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইয়াছে তাহাতে শুভ ফল ফলিবে নিঃসন্দেহ।

সভাপতি ডাফ সোসাইটির সাধারণ কার্য্য সমাপনান্তে একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে নীল-আন্দোলন লইয়া বাঙালী চিত্তে ঘোর আলোড়ন উপস্থিত হয়। নির্য্যাতিত

নিপীড়িত নীলচাষীদের সপক্ষ ছিলেন খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ। পাদ্রীদের সহযোগিতা লাভ করায় এই আন্দোলনের কথা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটে। শিক্ষিত বাঙালীরাও মনে বেশ জোর পাইলেন। নীলচাষীদের অনুকূলে তাঁহারা সংবাদপত্রে সংবাদাদি প্রেরণ ও অন্যান্য কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 'নীল-দর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের অপরাধে শ্বেতাঙ্গ নীলকর সমাজ এবং ইংরেজী সংবাদপত্রের ইংরেজ সম্পাদকদের যোগসাজসে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া পাদ্রী লঙ্‌ কারাদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হন। বাঙালীরা স্বতঃই লঙের সমর্থন করেন। এই ব্যাপারে সাধারণ ভাবে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বৈরিভাব দেখা দেয়। সভাপতি ডাফ বক্তৃতায় নীল আন্দোলনের কথা বলেন নাই বটে, তবে ইহার ফলে উদ্ভূত সমকালীন বৈরিভাবের বিষয় আবেগভরে উল্লেখ করেন। তিনি বলিলেন যে, এই বেথুন সোসাইটি শিক্ষিত বাঙালীর পারস্পরিক মেলামেশার ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই জ্ঞানী, গুণী ইউরোপীয়েরা ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, সংবাদপত্রসম্পাদক, সকলেই আছেন। সুধী বাঙালী সমাজও বেথুন সোসাইটির উপকারিতা বুঝিয়া দলে দলে ইহাতে যোগ দিয়াছেন। সোসাইটির সহ-সভাপতি দুই জনের মধ্যে একজন বাঙালী—রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং বিভাগীয় সভাপতি ও সম্পাদকগণের মধ্যেও ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়ই দেখা যাইতেছে। ঐ দিনকার সভায়ও দেশী-বিদেশীর ভিড় কম নহে। এই সকল কারণে সভাপতি আশা করেন যে, এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার বৈরিভাব বিদূরণে সোসাইটি সমর্থ হইবেন। ডাঃ ডাফ এই কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া ভাষণ শেষ করিলেন :

"Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate,
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait."

সোসাইটির স্বাস্থ্য-বিভাগের অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ২৭শে ফেব্রুয়ারী। এই বিভাগের সভাপতি ডাঃ ব্রাউহাম "Sanitary condition of Calcutta" বা 'কলিকাতার স্বাস্থ্য'-বিষয়ক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। বক্তা বলেন—কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কলিকাতাকে সাধারণতঃ "City of Palaces" (প্রাসাদ-নগরী) বলা হইয়া থাকে, কিন্তু বক্তার মতে ইহা "City of filthy drains and intolerable odour"। বিগত ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে বেথুন সোসাইটির প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন কলিকাতার পৌর স্বাস্থ্যের উপর ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব্‌ চক্রবর্ত্তী; কিন্তু এক যুগ পরেও ইহার অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। এই প্রসঙ্গে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাও আমাদের স্মরণীয়। যাহা হউক, বক্তৃতার পর যে আলোচনা

সুরু হয়, তাহাতে সার্ বার্টলে ফ্রেয়ার কলিকাতার স্বাস্থ্যের কতকগুলি উন্নতিপ্রচেষ্টার কথা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে সভায় উল্লেখ করেন।

ডক্টর ডাফের সভাপতিত্বে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৬২ তারিখে। সোসাইটির প্রাচীন সভ্য নবীনকৃষ্ণ বসু পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বক্তৃতা দেন "The History, Economic Uses and prospects of Indian Cotton" সম্পর্কে। স্মরণাতীত কাল হইতে তূলাকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষে এক বিরাট্ বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঢাকার মসলিন ছিল জগৎপ্রসিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য বিলোপের দরুন এই শিল্পের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইতে থাকে। নবীনকৃষ্ণ বক্তৃতায় বলেন, সূতাকাটার কল আবিষ্কৃত হওয়ায় চরখা প্রতিযোগিতায় অপারগ হইয়া উঠিয়াছিল। কলের তাঁত আবিষ্কারের দরুন হস্তচালিত তাঁত ক্রমে অচল হইল। নবীনকৃষ্ণ বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধারের বিষয় এ বক্তৃতায় কিছুই বলেন নাই। তখন বিদেশের বাজারে তূলার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। নবীনকৃষ্ণ তূলা চাষের উৎকর্ষ সম্বন্ধেই সবিস্তারে বলিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপন্ন তূলার পরিমাণ এবং তাহার গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া, কি করিয়া উৎকৃষ্টতর তূলা বৃদ্ধি করা যায়, সে দিকে তিনি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ষষ্ঠ বা শেষ অধিবেশনে (১০ই এপ্রিল ১৮৬২) বক্তৃতা দেন মিঃ ম্যাকলারৃডি; বক্তৃতার বিষয়—"The Origin and Progressive Development of Steam Engine"। তখন বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ-বাহুল্য হেতু ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব উপস্থিত হয়। কাজেই এ বিষয়ে জানিবার আগ্রহ শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়। মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে লোকসমাগম হইয়াছিল বিস্তর। সভাপতি ডঃ ডাফ সভার মামুলি কার্য্য এ দিন সকলই বন্ধ রাখেন। শুধু তিনি সভায় ঘোষণা করেন যে, সোসাইটির 'ট্রানজ্যাকসান্‌স ১৮৫৯-৬১' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে সোসাইটির পূর্ব্বাপর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিয়মাবলী, সদস্যদের তালিকা, এই দুই বৎসরের অধিবেশনগুলির বিবরণ, বাছাই করা পঠিত প্রবন্ধসমূহ, বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যক্রম—এই সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'ট্রানজ্যাকসন' সোসাইটির কার্য্যাবলীর আকর গ্রন্থস্বরূপ। সোসাইটির ইতিহাস রচনায় এই পুস্তকগুলির প্রয়োজনীয়তা যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুধু বেথুন সোসাইটি নহে, সে যুগের অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধেও এই একই কথা। সমকালীন সংবাদপত্র সাময়িক পত্রাদিও এই সকল প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত রচনায় সবিশেষ সাহায্য করে।

বেথুন সোসাইটির নব রূপায়ণের পর হইতে প্রতি বৎসর নবেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ছয়টি মাসিক অধিবেশন হইত। বিভাগীয় ও অন্যান্য কার্য্যও এই সময়ের

মধ্যেই নির্ব্বাহ হইত। রামচন্দ্র মিত্রের পদত্যাগের পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে কৈলাসচন্দ্র বসু সোসাইটির সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। কৈলাসচন্দ্র ছিলেন একজন নামজাদা শিক্ষাবিদ্। সোসাইটির দ্বাদশ বর্ষের কার্য্য আরম্ভ হইল ১৩ই নবেম্বর ১৮৬২ হইতে। ডক্টর ডাফ সোসাইটির সভাপতিরূপে একটি প্রাথমিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি এইরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মৃত্যু, বিলাত যাত্রা, কলিকাতা হইতে অন্যত্র গমন প্রভৃতি নানা কারণে বিভিন্ন শাখার কার্য্য গত বৎসর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিভাগের সভাপতি রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হইয়াছে, সমাজবিজ্ঞান সভার সভাপতি পাদ্রী লঙ্ এবং শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি হেনরি উড্রো বিলাত গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন স্তর ও বয়সের দেশী-বিদেশীর সমাগম দেখিয়া তিনি মনে করেন, সোসাইটির কার্য্য ক্রমশই জনসমাদর লাভ করিতেছে। বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনের বক্তা ও বক্তৃতার ফিরিস্তি এবারে তিনি সভার সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। তবে প্রত্যেকটি অধিবেশনেই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমাজকল্যাণকর বক্তৃতা যে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ক্রমে আমরা দেখিতে পাইব।

প্রাথমিক কার্য্য সমাধা হইলে সভাপতি ডাফের অনুরোধে ডাঃ নরম্যান চেভার্স বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—"The Sanitary Position and Obligation of the Inhabitants of Calcutta," অর্থাৎ, কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা ও বাধ্যবাধকতা। ডাঃ চেভার্স আট বৎসর পূর্ব্বে বেথুন সোসাইটিতে অনুরূপ বিষয় লইয়া দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি কলিকাতাস্থ দেশী-বিদেশী বহু পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছেন। শহরের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলে কলিকাতার রূপ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য। তিনি এদিকে কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন। শহরের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে তিনটি বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবশ্য এবং আশু কর্ত্তব্য—১। পানীয় জল-সরবরাহ, ২। পয়ঃপ্রণালী এবং ৩। ময়লা-নিষ্কাশন। তিনি হিউ ম্যাকনফার্লন-কৃত জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে অবহিত হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুরোধ জানান।

ডাঃ চেভার্সের একান্ত সময়োপযোগী বক্তৃতার পরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনায় যোগদান করেন। সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা দেন সোসাইটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রাজা কালীকৃষ্ণ। সোসাইটির সভায় তিনি বরাবর বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এবারেও তিনি একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের আবশ্যকতা ভারতবর্ষে যে যুগ যুগান্ত হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহা তিনি নানা সংস্কৃত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করিলেন। ইহার আবশ্যকতা যে কত অধিক অনুভূত হইয়াছিল একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন। শ্লোকটি এই :

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ॥"

বড়লাটের আইন-সভার সদস্য রাজা দিনকর রাও এবং কালীকুমার দাস আলোচনায় যোগ দেন। কালীকুমার কলিকাতার স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে পৌর-সভা ব্যতিরেকে সরকারেরও যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, সে বিষয়ে উল্লেখ করেন।

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৬২ দিবসে। এ দিন বক্তৃতা দিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। বক্তৃতার বিষয়—"Hiudu Women and Their Connection with the Improvement of the Country.", অর্থাৎ, হিন্দু নারী এবং ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক। কিশোরীচাঁদ স্ত্রীজাতির শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। কাশীপুরে নিজ বাটীতে তিনি বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। বিদ্যাসাগর-প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন সমর্থক। ভারতবর্ষের উন্নতি-প্রচেষ্টায় নারীর সাহচর্য্য ও সহযোগিতার গুরুত্ব কিশোরীচাঁদ মনে প্রাণে অনুধাবন করিয়াছিলেন। স্বদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সর্ব্ববিধ উন্নতিতে নারীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উক্ত বক্তৃতায় বিশদরূপে বর্ণনা করেন। স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে নারীচিত্তের উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারিলেই তবে তাঁহারা পুরুষের সঙ্গে একযোগে স্বদেশের কল্যাণকর্ম্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন। এ জন্য তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও উক্ত বক্তৃতায় বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন। একটি কবিতার দুইটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার মনোভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত করিলেন :

"The Woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or godlike, bond or free.

অর্থাৎ, নর এবং নারী উভয়েরই সমস্যা এক ; তাঁহারা একত্রে উঠিবেন বা নামিবেন দেবতার মত বা বামন হইয়া, দাস অথবা স্বাধীনরূপে।

এদিনকার সভায় দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন—বঙ্গের ছোটলাট সার্ সিসিল বীডন, বড় লাটের আইন-সভার সদস্য, পদস্থ কর্ম্মচারী, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, দিগম্বর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং আরও অনেকে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন সিসিল বীডন, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ ঘোষ, যদুনাথ বসু, নবীনচন্দ্র বড়াল এবং যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ শিক্ষিত ব্যক্তিদের সদিচ্ছায় সন্দেহ না করিয়াও বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রী-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে অনেকে মনে মুখে এক নহেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে হয় ত ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যকালে অগ্রসর হইতে ভয় পান। এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণটি পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

এবারকার তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী। ডাফ প্রারম্ভিক ভাষণে উপস্থিত সদস্যগণকে এই আশ্বাস দেন যে, সোসাইটির বিভাগগুলি পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে

পারিবে। গত অধিবেশনে প্রদত্ত কিশোরীচাঁদ মিত্রের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইতিমধ্যেই শিক্ষিত বাঙালীদের ভিতর উহার শুভ-ফল দেখা যাইতেছে। স্ত্রীজাতির উন্নতির দিকে তাঁহারা অবহিত হইয়াছেন। সভাপতির আহ্বানে মিঃ ম্যাকৃক্রিণ্ডেল 'The Crusades' শীর্ষক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাশেষে মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া, বক্তৃতার মধ্যেকার কতকগুলি উক্তি সম্বন্ধে আপত্তি জানান। সভাপতি এবং বক্তা উভয়েই ইতিহাসের ভিত্তিতে সকল আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তথাপি এ ধরণের মিশ্র সভায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান কোন ধর্মাবলম্বীর পক্ষে আপত্তিকর কোন-কিছু না বলার যুক্তিযুক্ততা অবশ্যই মানিয়া লইলেন। এই সময় একদল ব্রিটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা সোসাইটির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ রাসেল জেফ্রি মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতার কথা উত্থাপিত করেন।

বেথুন সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশনে (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩) সভাপতি ডাফ সোসাইটির সদস্যগণকে জানান যে, শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি মিঃ হেনরি উড্রো এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে এই বিভাগটি পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিবে। তিনি অতঃপর সাহিত্য-শাখার সভাপতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাউয়েলকে তাঁহার বক্তৃতা দানের জন্য আহ্বান করেন। অধ্যক্ষ কাউয়েলের এদিনকার বক্তৃতার বিষয়—"Contrast between Legendary and Authentic History", অর্থাৎ, কাহিনীমূলক ও তথ্যমূলক ইতিহাসের তারতম্য। কাউয়েল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সোসাইটির এক অধিবেশনে ভারতবাসীদের পক্ষে ইতিহাস-পাঠের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কাউয়েল প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসেন। ইতিহাস-চর্চ্চার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ থাকা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তখনও এদেশে ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চ্চায় ইউরোপীয়েরাই প্রধানতঃ লিপ্ত ছিলেন। ভারতবাসীদের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চ্চার গুরুত্ব সম্বন্ধে কাউয়েল সাগ্রহে সোসাইটির সভায় আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাস-চর্চ্চার পক্ষে চারিটি যুগ বাছিয়া লন। অতি আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার পক্ষে মালমশলা বা উপকরণসমূহ অপ্রতুল নয়; কিন্তু মধ্য, প্রাচীন ও অতি-প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক তথ্যাদি নিরূপণ খুবই শ্রমসাধ্য এবং এসব ক্ষেত্রে কাহিনী ও তথ্য আলাদা করিয়া, অথচ উভয়ের মধ্যে যতটুকু সামঞ্জস্য সম্ভব তাহা বজায় রাখিয়া ঐ ঐ যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। কাউয়েল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ধারা পরবর্ত্তীকালে কমবেশী অনুসৃত হইয়াছে।

এই অধিবেশনে বোম্বাই-নিবাসী তিনজন পার্শী মনীষী উপস্থিত ছিলেন—ডাঃ ভাওদাজী, আর্দেশজী ফ্রেমজী এবং খুর্শেদজী রুস্তমজী কামা। সভাপতি ডাঃ ডাফ তাঁহাদিগকে

সভ্যদের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ পার্শীদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, কর্মৈষণা, দানশীলতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন। অতিথিগণ একে একে সোসাইটির সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমনের বিষয় ব্যক্ত করেন। বাংলা-দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাদি অবগত হওয়া তাঁহাদের একটি উদ্দেশ্য। ডাঃ ভাওদাজী এখানে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ধারণা হইয়াছে, এ বিষয়ে বোম্বাই অগ্রবর্ত্তী। তবে সাধারণ শিক্ষায় বাঙালীরা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর। আর্শেদজী ফ্রেমজী বলেন, বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজের ছাত্রগণ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অগ্রণী। যাঁহারা দুঃস্থ নিঃসম্বল তাঁহাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। খুর্শেদজী রুস্তমজী কামা পার্শীজাতির উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেথুন সোসাইটির মাধ্যমে শুরু হয়।

সোসাইটির পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হয় ১৯শে মার্চ্চ ১৮৬৩ তারিখে। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য ও দর্শন' বিভাগের একটি সাধারণ সভা হইয়াছিল। এই বিভাগের সভাপতি অধ্যক্ষ কাউয়েল উক্ত সভায় জানান যে, মাধবাচার্য্য-বিরচিত সুবিখ্যাত 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থখানির অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখানি প্রকাশিত হইলে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এবং বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে যে সংস্কৃত বিদ্যাধারার পুনরুত্থান হয় তাহা সুন্দরভাবে সূচিত হইবে। এই সময়ে ইউরোপে পেট্রার্ক ও বোকাসিও দ্বারাও রেনেসাঁস্ বা প্রাচীন বিদ্যার পুনঃপ্রচার শুরু হইয়াছিল। সাহিত্য ও দর্শনশাখার এতাদৃশ কার্য্য দ্বারা দেশের কি উপকার সাধিত হয় তাহা অল্প কথায় বলা চলে না। মাসিক অধিবেশনে ডক্টর ডাফ জানান যে, 'স্ত্রীজাতির উন্নতি' বিভাগ পুনর্গঠিত হইয়াছে। সভাপতি রমা-প্রসাদ রায়ের মৃত্যু এবং সম্পাদক হরচন্দ্র দত্তের পদত্যাগ হেতু এই বিভাগের কার্য্য এ যাবৎ একরূপ বন্ধই ছিল। এবারে সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য রাজা কালীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ সভাপতির পদ গ্রহণ করায় এই বিভাগের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইল। ডাফ বলেন, পরবর্ত্তী ২৬শে মার্চ ইহার এক সাধারণ অধিবেশন হইবে। ডাফের আহ্বানে ঐ দিনকার বক্তা মিঃ ডন "Modern German Speculation—its methods and results" শীর্ষক একটি ভাষণ দেন। কাণ্ট, হেগেল, প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান মনীষীদের দার্শনিক চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি এই বক্তৃতার মধ্যে সহজ সরলভাবে আলোচিত হয়। সোসাইটির অন্যতম উৎসাহী সদস্য কালীকুমার দাস এই ধরণের চিন্তার সমালোচনা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দিবসে, ২৬শে মার্চ্চ তারিখে 'স্ত্রীজাতির উন্নতি' বিভাগের একটি সাধারণ সভার আয়োজন হয়। সভায় জনসমাগম দৃষ্টে বুঝা গেল, স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে সাধারণের মনে আগ্রহের কথঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে। সভাপতি কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রথমেই বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সামাজিক বিরূপতা অপেক্ষাকৃত অল্পকালের

ব্যাপার। পূর্ব্ব যুগে নারীদের শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা অবশ্যই স্বীকৃত হইত। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক যুগে যে কত অধিক সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। সামাজিক, আর্থিক এবং নৈতিক উন্নতির পক্ষেও স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক। এই বিভাগ এদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবে। ৯ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত শেষ মাসিক অধিবেশনে সভার বিবরণ প্রদত্ত হইবার পর, সভাপতি ডঃ ডাফ ঐ দিনকার বক্তা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। বক্তৃতার বিষয়—"The Effects of English Education in Bengal"—বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষার ফল। বক্তৃতায় মহেশচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার শুভ ফলের কথাই বেশী করিয়া বলেন। কালীকুমার দাস এবং দ্বারকানাথ ঘোষ অন্য দিকের কথাও আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু কিন্তু মূল বক্তার উক্তিগুলির সমর্থনেই নিজ অভিমত প্রকাশ করেন।

সোসাইটির পুনর্গঠনের পর প্রায় চারি বৎসর কাল ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছিল। বিভিন্ন বিভাগের কাজে নানা কারণে অবশ্য কতকটা বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ডাঃ ডাফ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ইহার পর একেবারে স্বদেশ স্কটলণ্ডে চলিয়া যান; ভারতবর্ষে আর আসেন নাই। তিনি ১৮৬৩, ১৩ই জুলাই এক পত্র দ্বারা সোসাইটির কৌন্সিলকে তাঁহার অসুস্থতা এবং কলিকাতা ত্যাগের বিষয় জানাইলেন। ১৮৩০ সনে ডাফ কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। ঐ সনেই রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় তিনি কলিকাতায় একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি হইতে ক্রমে দুইটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—জেনারাল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন এবং ডাফ কলেজের উদ্ভব হয়। ডাফ খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচার এবং পুস্তকাদি প্রকাশ দ্বারা কিছুকাল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকুণ্ঠ ভারতপ্রীতিতে শেষ পর্য্যন্ত সকলেই মুগ্ধ হন। নীল-আন্দোলনে যে-সব পাদ্রী প্রজাদের সমর্থক ছিলেন ডাফ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে আসিয়া তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ ভারত-ত্যাগের সঙ্কল্পে সোসাইটির সদস্যগণ স্বভাবতঃই দুঃখিত হন। ১৮৬৩, ১০ই সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভার আয়োজন করিয়া সভ্যগণ নানা প্রস্তাবের মধ্যে তাঁহার গুণপনা ও কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করেন। এই সভায় তাঁহাকে একখানি মানপত্র-দান এবং সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে কোন সাধারণগম্য হল-ঘরে তাঁহার একখানি চিত্র রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই দিনের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সোসাইটির অন্যতম সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ। সোসাইটির সদস্য এবং দেশী-বিদেশী গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া ইহার কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করেন। মানপত্র-দানের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন নব-রূপায়িত কলিকাতা হাইকোর্টের দেশীয় বিচারপতি শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত। এই সাধারণ সভায় ডক্টর ডাফকে বেথুন সোসাইটির 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্ব্বাচন করা হয়।

৩

ডাফ কর্তৃক সভাপতির পদ ত্যাগের পর নূতন সভাপতি নির্ব্বাচনে কিছু বিলম্ব হইয়া যায়। এই সময়ে ইহার মাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতি ডাঃ নর্মান চেভার্স। ১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বৎসরের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ১২ই নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখে। চেভার্স সভাপতির ভাষণে পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যকলাপের কথা বিবৃত করেন। তিনি সভার সভ্য সার্ জেমস্ আউটরামের মৃত্যুতে সভার পক্ষ হইতে দুঃখ প্রকাশ করেন। গত বৎসরের অন্যতম প্রধান ঘটনা ডক্টর ডাফের ভারত-ত্যাগের কথাও তিনি উল্লেখ করতে ভুলেন নাই সোসাইটির ছয়টি বিভাগের মধ্যে দুইটির কার্য্য গত বৎসর কতকটা চলিয়াছিল। এ দুইটি বিভাগ যথাক্রমে সাহিত্য ও দর্শন', সভাপতি—ঈ. বি. কাউয়েল; 'স্ত্রীজাতির উন্নতি' বিভাগ, সভাপতি—কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ। প্রাথমিক বক্তৃতার পর ডাঃ চেভার্স মিঃ জর্জ্জ স্মিথকে তাঁহার ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—"Cameons"। ক্যামিয়ন্স পর্ত্তুগালের অধিবাসী। তিনি একজন অসমসাহসী ব্যক্তি ছিলেন। পর্ত্তুগালের আধিপত্যকালে তিনি নানা দেশে গমন করিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দেন। তিনি আবার একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার চোখের সম্মুখেই পর্ত্তুগালের আধিপত্য পূর্ব্বাঞ্চলের—ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশগুলিতে বিলুপ্ত হইতে থাকে। বিভিন্ন শক্তির আগমনের পরে ইংরেজরাই এখানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়।

ক্যামিয়নস্ কবিতার মাধ্যমে পর্ত্তুগালের পতনের কথা আবেগভরে অথচ দুঃখের সঙ্গে কাব্যছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্মিথ বক্তৃতার উপসংহারে ভারতীয় যুবকদের উদ্দেশ করিয়া বলেন—

> "It rests with you, my audience, and with the educated youth of India, so to cultivate your more enlightened aspirations and so to apply your higher knowledge each in his own sphere, that a time may be hastened when a greater poet than Cameons may be able to write a Britaniad, of which the glory of India shall from not the least prominent theme."

সে যুগের ব্রিটিশ এবং ভারতবাসী কেহই ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র কল্পনা করিতে পারিতেন না। তবে সদাশয় মনীষী ইংরেজেরা ভারতবর্ষের গৌরবগাথা স্বীকার করিয়া তাহাও ব্রিটেনের গৌরবগাথার সঙ্গে প্রকাশ ও প্রচারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন।

প্রথম মাসিক অধিবেশনের পর দিন ১৩ই নবেম্বর (১৮৬৩) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে একটি জনসভা হইল বেথুন সোসাইটিই আনুকূল্যে। এই সভার কথা পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞাপিত হওয়ায় বিস্তর জনসমাগম হইল। কলিকাতার বিশপ হেনরি কটন সভার সমক্ষে আট জন আন্দামানীকে উপস্থাপিত করিলেন। আন্দামান পরিভ্রমণান্তে তিনি এই

আন্দামানীদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। এই সকল আন্দামানীকে কিরূপে ধরিয়া আনা হইয়াছে তাহার বর্ণনা দিয়া মিঃ করবিন ইহাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

সোসাইটির দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১০ই ডিসেম্বর। এ অধিবেশনেও ডাঃ চেভার্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে সভাপতি ও সম্পাদক (কৈলাসচন্দ্র বসু) উভয়েই তাহা নিরসনে যত্নবান্ হন। সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সর্ব্ববিধ আলোচনার ব্যবস্থা; এখানে রাজনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন ডাঃ ডাফ সভাপতি হন, তাহার প্রকালে সোসাইটির উদ্দেশ্য ব্যাপকতর করা হয়। সমসাময়িক রাজনীতি এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ হইলেও উভয়ের মূল বিষয়াদির আলোচনাও এখানে গ্রাহ্য হওয়া স্থির হয়। সেই নিয়মই তখন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারে বহাল রাখা হইয়াছে—সভাপতি এবং সম্পাদক সদস্যগণকে এই আশ্বাস দিলেন। এই অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই। অধিবেশনের আরম্ভেই সভাপতি চেভার্স একটি বিষয়ের প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বেথুনের পরিবারের লোকেরা ডাঃ মৌএট মারফত সোসাইটিকে তামার পাতে খোদাই করা বেথুনের প্রতিকৃতি উপহার দিয়াছেন। মৌএট ইহার দুইশত কপি ছাপাইয়া সদস্যদের মধ্যে বিলি করেন।

ডাঃ চেভার্সের সভাপতিত্বে সোসাইটির তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইল ১৮৬৪ সনের ১৫ই জানুয়ারী। এই দিনে বক্তৃতা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ; বক্তৃতার বিষয়—"The Bengali at Home" বা গৃহস্থ বাঙালী। বাঙালী চরিত্র বিশ্লেষণে মনীষিগণ তখন তৎপর হইয়াছেন। জাতীয় দোষত্রুটি বাঙালীর গৃহ-রচনায় কতখানি প্রতিকূল তাহার আলোচনায়ও তাঁহারা ক্ষান্ত ছিলেন না। নারীজাতির উন্নতি-চিন্তাও তাঁহাদিগকে উদ্বেলিত ও কর্ম্মব্যস্ত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র নিজ ভাষণে এ বিষয়টির উত্থাপনেও উদাসীন ছিলেন না। প্রকাশ্যে বিচরণে নারীদের যথেষ্ট বাধা; এ কারণ তাঁহাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ও স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। বক্তৃতা দান শেষ হইলে পাদ্রী সি. এইচ. এ. ড্যাল বলেন যে, বাঙালীরা স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধানে সাম্প্রতিক কালে তৎপর হইয়াছেন দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত। নেতৃস্থানীয় বাঙালীরা এখন আর নারীগণকে বাহিরে লইয়া যাইতে দ্বিধাবোধ করেন না। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর মাতা ভগবতী দেবীকে আলোকচিত্রকর হাডসনের দোকানে লইয়া গিয়া আলোকচিত্র তুলাইয়াছেন। আজিকার দিনে হয়ত এ দৃষ্টান্তটি সাধারণের কৌতুকের উদ্রেক করিবে। কিন্তু শতবর্ষ পূর্ব্বে নারীজাতির উন্নতি প্রচেষ্টার প্রথম যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত লোকের মনে বলের সঞ্চার করিয়াছে।

সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশন (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪) হইতে রেভাঃ জেঃ মুলেন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে থাকেন। ডক্টর ডাফের ভারত-ত্যাগের কয়েক মাস পরে রেভাঃ মুলেন্স সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকিবেন। মুলেন্স-এর আহ্বানে ডাঃ কানাইলাল দে 'Combustion" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা কিছুকাল

বদ্ধ ছিল। কানাইলাল মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র এবং কলিকাতা সমাজে সুচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সকলেরই কৌতুহলের উদ্রেক করে।

পরবর্ত্তী অধিবেশন (১০ই মার্চ ১৮৬৪) বিশেষ স্মরণীয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সরকার সাড়ম্বরে একটি কৃষি-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। সরকার-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এ ধরণের প্রদর্শনী এই প্রথম। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্য করিয়া কিশোরীচাঁদ মিত্র "Agriculture with special reference to the Exhibition held in Bengal" শীর্ষক এক সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের কৃষি অবস্থার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের কথা উল্লেখ করেন। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সাহিত্য-দর্শন ধর্ম্মচিন্তা প্রভৃতির মূলে যে কৃষিকার্য্য কত রসদ জোগাইয়াছে তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের কৌশলাদি, এই কৃষির দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। সমাজের এত বড় হিতকর বিষয়ে তৎকালীন সরকার যে অবহিত হইয়াছেন তাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, সরকার এ যাবৎ এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। পনর বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষা-সমাজের ("Council of Education") সম্পাদক ডাঃ মৌএট (তিনি বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা) বঙ্গের জেলা স্কুলগুলির সঙ্গে একটি করিয়া কৃষি-শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। সেই সময় বারাসাত সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার একটি কৃষি-বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সমাজের বার্ষিক রিপোর্টে এ বিদ্যালয়টির বিবরণ আমি দেখিয়াছি। সরকারী ঔদাসীন্যে ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিশোরীচাঁদ বক্তৃতায় বারাসাত কৃষি বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ইহা সরকারী সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া উঠিয়া গিয়াছিল। কিশোরীচাঁদ তাঁহার স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, সরকার কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন না করিলেও তাঁহারা যেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে নিজেরাই অগ্রণী হন।

কিশোরীচাঁদের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার উপরে বিশেষ আলোচনা হয়। পাদ্রী ড্যাল বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলেন যে, শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকার করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্য দ্বারা এই শ্রমের মর্যাদা যুগে যুগে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, মহেন্দ্রলাল সোম, রেভাঃ লালবিহারী দে এবং যদুনাথ ঘোষ আলোচনায় যোগদান করেন। যদুনাথ বলেন যে, কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ছোটলাটের নিকট বেথুন সোসাইটির পক্ষে আবেদন প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। সভাপতি মুলেন্‌স একটি উপসংহার-বক্তৃতায় বলেন যে, কৃষিকার্য্যের সত্যকার উন্নতি করিতে হইলে ভূমির উপরে কৃষকের স্থায়ী অধিকার প্রদান করিতে হইবে। প্রজাসাধারণের মধ্যে এই বোধ জন্মিতে দেওয়া সর্ব্বাগ্রে উচিত। আবার, যেখানে ভূমি অতিরিক্ত উর্ব্বর এবং স্বল্প পরিশ্রমে অধিক শস্য উৎপন্ন হয় সেখানে এক নূতন

বিপদ দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিংহলে কফি চাষের জন্য সিংহলী চাষী না পাওয়ায় কানাডা হইতে চাষী সেখানে আমদানী করিতে হইয়াছে। ইহার ফলেও নানা অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। এদেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতির পক্ষে কৃষকদের ভূমিতে স্বত্ব-স্বামিত্ব দান এবং যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সোসাইটির ষষ্ঠ বা শেষ মাসিক অধিবেশন হইল ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখে। এই দিনে কলিকাতার বিশপ কটন একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—"The Clouds of Aristophanes with a sketch of Literature and Science of Athens about four Hundred years before Christ." নাম হইতেই বুঝা যায় এটি প্রধানত: সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা। খ্রীষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, পলিনেসিয়ান যুদ্ধের যুগে এথেনস উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বক্তা এই যুগকে ইংলণ্ডের 'এলিজাবেথান যুগে'র সঙ্গে তুলনা করেন। সাহিত্য দর্শন শিল্প বিজ্ঞান নানা বিভাগেই এথেন্সবাসীরা নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বক্তার মূল বক্তব্য 'কমেডি'র ব্যাখ্যা লইয়া আরম্ভ হয়। তিনি সক্রেটিসের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া বক্তব্য শেষ করেন।

বেথুন সোসাইটির ত্রয়োদশ বর্ষ এইরূপে সমাপ্ত হইল। ডাফ সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়া সোসাইটির কার্য্য সুসম্পন্ন করার নিমিত্ত ছয়টি বিভাগ গঠন করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য ও দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, স্ত্রীশিক্ষা এই সকল বিভাগের আলোচনার বিষয় ছিল। প্রথম প্রথম বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য বেশ সুরু হয়। কিন্তু ১৮৬৩ সনে ডাফের ভারত-ত্যাগের সময়েই চারিটি বিভাগের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। বর্ষশেষে (এপ্রিল ১৮৬৪) এই বিভাগগুলির কার্য্যের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সোসাইটির মাসিক অধিবেশনগুলি নিয়মিত হইতেছিল এবং পূর্ব্ববৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা করিতেছিলেন।

কবি শ্রীশঙ্করের ষষ্ঠীমঙ্গল

শ্রীভূপতি দত্ত

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এই সমস্ত কাব্যেই তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সমধিক। তাই বলে অল্প প্রতিভাবান্ কবিগণের রচিত ক্ষুদ্র পাঁচালী-জাতীয় মঙ্গলকাব্য-গুলিও অবহেলার বিষয় নয়। ক্ষুদ্রতর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও বাঙালীর মানসপ্রকৃতি বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এই প্রকার ক্ষুদ্র 'মঙ্গলগুলি'র মধ্যে ষষ্ঠীমঙ্গলের এক অপরিচিত কবিই আমাদের আলোচনার বিষয়। সভ্যতা ও যুগরুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন অনেক প্রতিভাবান্ কবির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়েছে তখন আর অপেক্ষাকৃত খ্যাতিহীন কবিদের কথাই উঠে না।

আমাদের আলোচ্য কবির নাম শ্রীশঙ্কর। পদবী কি তা জানা যায়নি। তবে ইনি যে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী 'কবিচন্দ্র' নন তা উভয়ের পরিচয় থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। 'কবিচন্দ্রের' পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী। পুত্রের নাম কুঞ্জবিহারী; লেগোর নিকট পাহুয়া (আধুনিক পেনো) গ্রামে তাঁর বসতি।[১] আমাদের শ্রীশঙ্করের পিতার নাম সীতারাম, অগ্রজ গোবর্দ্ধন এবং এঁদের 'রাণীর বাজারে' বাস ছিল।

'অভয়ামঙ্গল' রচয়িতা রামশঙ্কর দেবের কাব্যের ভণিতায়ও 'শঙ্কর' উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শঙ্কর ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ("শ্রীকরণে উৎপত্তি দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণী")। এঁর নিবাস হুগলি চাকলার অন্তর্গত ধর্ম্মদা গ্রামে। পিতার নাম রামকৃষ্ণ এবং পিতামহের নাম হরিবদন।[২]

'লক্ষ্মী মঙ্গল' বা লক্ষ্মীচরিত্রের রচনাকার হিসাবে এক শঙ্করের নাম পাওয়া যায়। ভণিতায় 'কিঙ্কর' বা 'কিঙ্কর শঙ্কর' দেখা যায়।[৩] 'পাগল শঙ্কর' বা শঙ্কর দাসেরও ছোটখাট কাব্য পাওয়া যায়।[৪] কিন্তু আমাদের কবি শ্রীশঙ্করের কোনও ভণিতায় 'কিঙ্কর', 'কিঙ্করশঙ্কর' বা 'পাগল শঙ্কর' জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়নি।

আর এক শঙ্কর আচার্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়; তাঁর নিবাস কুলচণ্ডা গ্রামে ("শঙ্কর রচিল যার কুলচণ্ডাবাস")।[৫] আমাদের আলোচ্য শঙ্কর এঁদের সকলের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়।

১ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)—পৃষ্ঠা ৬১৪

২ " " " ৭০১

৩ " " " ৭৯৮

৪ " " " ১০৩০

৫ " " " ৬১৭

এবারে দেখা যাক এ পর্য্যন্ত ষষ্ঠীমঙ্গলের কোন্ কোন্ কবির নাম আবিষ্কৃত হয়েছে।

কৃষ্ণরাম দাস ১৬০১ বা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করেন। তাঁর কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না। রুদ্ররাম চক্রবর্তী নামেও এই কাব্যের একজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। ভাষা বিচারে মনে হয় ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবিচন্দ্র গুণরাজের ভণিতায় ষষ্ঠীমঙ্গলের পদ পাওয়া গেলেও কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।[৬]

এ ছাড়া রামধন চক্রবর্ত্তীও ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন; রচনাকাল সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। আর শিবানন্দ কর নামেও ষষ্ঠীমঙ্গলের একজন কবি ছিলেন।[৭]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ষষ্ঠীমঙ্গলের কবি শ্রীশঙ্করের নাম এখনো অনাবিষ্কৃত। শ্রীশঙ্করের কোন পুঁথি আমাদের হস্তগত হয়নি। মেদিনীপুরের দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে প্রাপ্ত গায়েনদের দুটি হস্তলিখিত খাতাই এ বিষয়ে একমাত্র অবলম্বন।[৮] একটিতে কোন কোন পদের ভণিতায় কৃষ্ণদাস নামক এক কবির উল্লেখও পাওয়া যায়। কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য থেকে বুঝতে পারা যায় এই কৃষ্ণদাস পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণরাম দাস নন। তবে অন্য খাতাটিতে সর্ব্বত্র কেবলমাত্র শঙ্করের ভণিতা এবং উভয় খাতায় মূলতঃ একই রচনা দেখে মনে হয় সমস্ত অংশের কবিই শ্রীশঙ্কর। ষষ্ঠীমঙ্গলের প্রথম কবি কৃষ্ণরাম দাস কেবল কৃষ্ণদাস রূপে মাঝে মাঝে শঙ্করের কাহিনীর ভণিতাংশেও যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। কোন কোন পদে ওড়িয়া ভাষার প্রভাব দেখে মনে হয় উড়িষ্যার ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত ঐ অঞ্চলের গায়েনদের হাতেই এই রূপান্তর ঘটেছে। পাঁচালি থেকে কোন প্রকারে শ্রীশঙ্করের কাব্যরচনা কাল ও সামান্যতম পরিচয় উদ্ঘাটন করা যেতে পারে।

পাঁচালির গোড়ার দিকে কবির কাল ও পরিচয় এই ভাবে উল্লিখিত হয়েছে :—

আন্থ বসু চন্দ্রকলা　　শেষে পাটরাণী নীলা
নাম যার সিদাম সুদাম।
রাণীর বাজারে স্থিতি　　যশোমতী পুণ্যবতী
বিশালাক্ষী পদে যার আশ॥
তাহার অনুজ শ্যাম　　সীতারাম তার নাম
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবর্দ্ধন।
তাহার অনুজ ভাই　　ষষ্ঠীর আদেশ পাই
শ্রীকবি শঙ্করে রস গান॥[৯]

৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)—পৃষ্ঠা ৬৭৯-৬৮০

৭ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (২য় সং)—পৃষ্ঠা ৭৯৯, ৭৯৮

৮ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খেজুরী থানার জাহানাবাদ গ্রামনিবাসী ভূষণচন্দ্র মণ্ডল (গায়েন) ও সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের (গায়েন) নিকট থেকে খাতা দুটি পাওয়া গিয়েছে। উক্ত অঞ্চলে ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে এখনও গায়েনেরা গৃহস্থের বাড়িতে এই গান করেন।

৯ আবিষ্কৃত দুইটি খাতার সাহায্যে পদাংশটি খাড়া করা হয়েছে।

'আত্ম বসু চন্দ্র কলা' অর্থাৎ ১৬৮১ শকাব্দ বা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ কাব্য-রচনার কাল মনে করা যেতে পারে। 'তাহার অনুজ শ্যাম' ও 'সীতারাম তার নাম' অংশ দুটি অর্থের দিক দিয়ে পরস্পর সঙ্গতিহীন। 'অনুজ' কথাটি 'তনুজ'ও হতে পারে। তবে সীতারাম যে শ্রীশঙ্করের পিতা তাতে সন্দেহ নেই। কেন না বহু পদের ভণিতাতে দেখি—

সীতারাম তাত এক অংশে জাত
শ্রীকবি শঙ্করে ভনে ॥

'সিদাম সুদাম' নামটি পদবী ও নামের মিশ্রণ বা বিকৃতি মনে হয়। তা ছাড়া 'সুদামের' সঙ্গে 'আশ'-এর মিল না থাকায় নামটি যে রূপান্তরিত তা বোঝা যায়। কবির পূর্ব্বপুরুষদের বা কবির বাস যে 'রাণীর বাজারে' ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এই শ্রীশঙ্করের কাহিনী কৃষ্ণরাম দাসের কাহিনী [১০] থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রুদ্ররামের কাহিনীর সঙ্গেও এর কোন যোগ নেই। তা ছাড়া রুদ্ররামের বর্ণিত কাহিনীগুলির 'কোনটিরই বঙ্গদেশে প্রচলিত ষষ্ঠী দেবী সম্পর্কিত কোন কাহিনীর সঙ্গে মিল নাই'।[১১]

এবারে শঙ্করের কাহিনীটির বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

একদিন কৈলাসে ষষ্ঠীদেবী সুলোচনাকে জিজ্ঞেস করেন কোথায় গেলে তাঁর পূজা প্রচারিত হবে। তখন সুলোচনা বলেন—দিলীপ নগরে জয়সিংহ নামে এক রাজা আছেন, তিনি শিবভক্ত। তাঁর সাত রাণী, কিন্তু পুত্র-কন্যা নেই। তুমি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ভিক্ষার ছলে রাজার কাছে গিয়ে পুজো চাইবে। বিফল হলে ঘাটের 'কূলে' অপেক্ষা করে থেকো। ছোট রাণী বিমলী (বা 'বিম্বলী') সেখানে এলে তাকে সাত পুত্রের বর দিও। এইভাবেই রাজগৃহে তোমার পুজো প্রচারিত হবে।

ষষ্ঠীদেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে জয়সিংহের সভায় আসেন। রাজা যত্নসহকারে তাঁকে আসন দেন ও সোণার থালায় মাণিক উপহার দিতে চান। কিন্তু দেবী অপুত্রক রাজার উপহার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাজাকে সঙ্গে সঙ্গে নিন্দাও করেন। তখন রাজ-আজ্ঞায় কোটাল কর্তৃক ছদ্মবেশিনী দেবী বহিষ্কৃত হন। ষষ্ঠীদেবী তখন সুলোচনার কাছে গিয়ে বলেন—

বুদ্ধি বল মোরে গো উপায় বল মোরে।
কুন রূপে পূজা নিব রাজার মন্দিরে ॥

সুলোচনা তাঁকে ঘাটে গিয়ে রাণীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দেবী তাই করেন। সাত রাণী স্নানের জন্য ঘাটে আসে। কেবল ছোট রাণী ছাড়া সবাই ফিরে যায়। দেবী ছোট রাণীকে আত্মপরিচয় দেন। বরও দিতে চান তিনি। ছোট রাণী বলে, তার তো দেবীর কৃপায় কোন ধনের অভাব নেই। উত্তরে দেবী বলেন, সবার সেরা পুত্রধনই রাণীর নেই; অন্য ধন থেকেই বা কি লাভ!

১০ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)—পৃষ্ঠা (৬৭৭-৬৭৯

১১ „ „ „ —পৃষ্ঠা ৫৮১।

পর্ব্বত প্রমাণ যদি গৃহে ধন রহে।
অপুত্রীর মৃত্যুকালে রাজা সব লহে॥

শুধু তাই নয়,

কানাখড়া হইয়া যদি পুত্র থাকে ঘরে।
মৃত্যুকালে অবহেলে পিণ্ডদান করে॥

ছোট রাণীকে দেবী পুত্রবর দেন। আর ছোট রাণীও বর পেয়ে ষষ্ঠীপূজার অঙ্গীকার করে।

যথা সময়ে পুত্র সন্তান প্রসব করে ছোটরাণী। কিন্তু ছ-রাণী ঈর্ষাকাতর হয়ে প্রসবের সময় ছোট রাণীর শিশু অপহরণ করে জলে ফেলে দেয়, আর ছোট রাণী মুড়া ঝাঁটা প্রসব করেছে বলে প্রকাশ করে। রাজা বিস্মিত হন। এইরূপে সতীনেরা আরও ছটি শিশু পরপর অপহরণ করে। রাজাকে জানায়, ছোট রাণী 'ইট', 'কাঠ', 'ঢেসনা' (উননের কাঠ) প্রভৃতি প্রসব করেছে। অমঙ্গলের আশঙ্কাও প্রকাশ করে তারা। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ছোট রাণীকে হত্যা করতে চান কিন্তু পাত্র-মন্ত্রীদের কথায় শেষে তাকে ঘোড়াশালে পাঠাতে রাজী হন। ঘোড়াশালে রাণীর দুঃখের অবধি থাকে না।

আকুলে ব্যাকুলে রাণী করয়ে রোদন।
বর দিয়া ষষ্ঠী দেবী বধিল জীবন॥

অনাহারে দিন কাটে তার। তবুও চোখে ঘুম আসে। গভীর রাত্রে দেবী এসে রাণীকে সান্ত্বনা দেন—

কেন কান্দ বিম্বলা গো না কাঁন্দ আর।
বর দিয়া আমি বন্দী হয়েছি তোমায়॥

*　　　　*　　　　*

বেঁচে আছে তব পুত্র জলের ভিতরে।
এস বাছা দুগ্ধ দিয়া আসিবে সত্বরে॥

ছোটরাণী খুশি হয়ে দেবীর সঙ্গে যায়।

এদিকে ভোর বেলা ঘোড়াশালে রাণীকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা দেখে রাজা সন্দিগ্ধ হন। ছোটরাণীর প্রতি ষষ্ঠীর করুণার কথা না জেনে তিনি তাকে দ্বিচারিণী মনে করেন।—

মাজিলে বাসন চিকন জলের চিকন বায়।
পর পুরুষে নারী চিকন ছেলে চিকন যায়॥[১২]
প্রায় বুঝি কার সঙ্গে করিছে পীরিতি।
এত অপরূপ কেন হয়েছে যুবতি॥

১২ পাঠান্তর,　　মাজলে ঘসলে পিতল চিকণ জল চিকণ বায়।
স্বামী সেবার নারী চিকণ ছেলে চিকণ মায়।

রাণীকে হত্যা করতে উদ্যত হন রাজা। কিন্তু রাণীর অনুনয়ে তাঁর সঙ্গে সরোবরে যান। দেবী তখন সাতটি শিশু নিয়ে দেখান। আর শিশুরাও

ডালেতে বসিয়া যেন পক্ষী করে রা।
সেই মত শব্দ করে পাইয়া নিজ মা॥

রাজা বিস্মিত হলে দেবী আনুপূর্ব্বিক কাহিনী বিবৃত করেন। দেবী অন্য ছ-রাণীকেও করুণাবশে ছ-টি শিশু উপহার দেন। সেই থেকে দিলীপ নগরে ষষ্ঠীপূজা প্রচারিত হয়।

শ্রীশঙ্করের কাহিনীতে আমরা যে ষষ্ঠীকে পাই তিনি জলষষ্ঠী।

জলষষ্ঠী নাম মোর জগতে খ্যাতি।
প্রথমে করিল পূজা শ্রীহরি পার্ব্বতী॥

*　　　*　　　*

জলষষ্ঠী মোর নাম আছে সর্ব্বদাই।
মোরে না করিলে পূজা পুত্র বেঁচে নাই॥

বাঙলা দেশে বার মাসে বিভিন্ন প্রকৃতির ষষ্ঠী পূজিতা হন। কিন্তু জলষষ্ঠীর উল্লেখ সাধারণতঃ কোথাও দেখা যায় না।[১৩] মনে হয় এই প্রকৃতির ষষ্ঠী শিশুদের জলের ফাঁড়া নিবারণের জন্য উদ্ভব হয়েছে।

এবারে কবির রচনার নমুনাস্বরূপ কোন কোন অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শেষ করি।

ষষ্ঠীর রূপ বর্ণনা :—

মাথে শোভে মাথা সিঁতি　　যেন মুকুতার পাঁতি
রবি শশী উদয় যেমনি।
কুণ্ডল কনক হার　　কি দিব তুলনা তার
ঝাঁপা দুলে শোভে যেন মনি॥
কর্ণে শোভে কর্ণপুর　　তিমির করিয়া দূর
মাথা সিঁতি বিজুলি কপালে।
দশনখ দুহু করে　　চন্দ্র যেন শোভা করে
রতনের হার শোভে গলে॥
নাসায় বেসর দুলে　　মণিময় হার গলে
উচকুঁচে কাঁচলির ভার।

১৩ "বৈশাখে ধূলাষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কোড়াষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থনষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্ত্তিকে গোটষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলাষষ্ঠী, পৌষে পাটাইষষ্ঠী, মাঘে শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোকষষ্ঠী এবং চৈত্রে লালষষ্ঠী।"—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং), পৃষ্ঠা ৬৭৬।

দুকরে বলয়া সাজে　　কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
গলে শোভে সুবর্ণের হার ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরি সাজে　　চরণে নূপুর বাজে
দশনখ জিনি শশধর।
মরাল গমনে চলে　　যেমনি বিজুলি খেলে
কত শত গুঞ্জরে ভ্রমর ॥

ষষ্ঠীর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ বর্ণনা :

...　　...　　...
পাকিল মাথার কেশ শঙ্খের মতন ॥
তিন কাল পূর্ণ হৈল হাতে বেতের বাড়ি।
পরিধান কৈলা মাতা দিব্য পাট শাড়ী ॥
ব্রাহ্মণীর বক্ষস্থলে দুই স্তন দুলে।
চলিতে না পারে বুড়ি বাতাসের হেলে ॥
লড়ি ধরে উঠে বুড়ি ভূমি ধরে বৈসে।
...　　...　　..

রাজা ও ছোটরাণীর মিলন বর্ণনা :

...　　...　　...
মদনে মূর্চ্ছিত রাজা আকুল পরান।
নৃপতির হৃদয়ে বিন্ধিল কাম বাণ ॥
কামাতুর হয়ে রাজা পাসরিল বাহু।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন গরাসিল রাহু ॥
...　　...　　...
নব ঘন মেঘে যেন যামিনী চকিত।
পতি দেখে রতি যেন প্রেমে পুলকিত ॥
সুরতির কালে যেন বৃষভ মাতিল।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন গর্জ্জন করিল ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে করয়ে চুম্বন।
মধু লোভে মত্ত যেন ফিরে অলিগণ ॥
...　　...　　...

ছোট রাণীর সাধভক্ষণে বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা :

...　　...　　...
পান্তার সহিত ব্যঞ্জন বাসি ॥
বাথুয়া টলটলি তৈলেতে পাক।
ডঁকি ডঁকি ভাজ ছোলার শাক ॥

চুনার চড়চড়ি কুমুড়ার বড়ি।
সরল সফরি ভাজা চিঙ্গুড়ি ॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলে চিনি কিছু মিশায়ে খই ॥
পাকা চাঁপা কলা করিব জড়।
খেতে মনে সাদ করেছে বড় ॥
কনক থালাতে অন্ন যে ঢালি।
কাঞ্জির সহিত করিয়া মেলি ॥
হেন কাঁজি খাইতে মনে যে ভাই।
কচি কচি মূলা বেগুন তাই ॥
আমড়া নুয়াড়ী পাকা চালতা।
আমসি কাগুণ্ডি কুল করঙ্গা ॥
খোড় ডম্বুর যে ইলিশ মাছে।
পাইলে মুখের অরুচি ঘুচে ॥
হিয়া ধক্‌ধকি অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক ॥
মনে করি সাদ খাইব পিঠা।
নারিকেল দই খাইতে মিঠা ॥
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাথা।
খনে উঠে হাই এ বড় ব্যথা ॥
দুধে তিলে গুড়ে মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত ক্ষুদের জাউ ॥
চিনি চাঁপা কলা দুধের সর।
কহি বড় দিদি শুন গো আর ॥
ঝুনা নারিকেল চিনির গুড়া।
কহি আপনার সাধের চূড়া ॥
কি কহিব আর অধিক মনে।
শ্রীকবি শঙ্করে সঙ্গীতে ভনে ॥[১৪]

[১৪] বঙ্গবাসী প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অন্তর্গত 'নিদয়ার মনের কথা' অংশের সহিত ইহার মিল আছে।

শব্দ-সংগ্রহ

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থাপনাবধি পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সাহিত্য ও জীবনধারার পর্যালোচনা করা। ফল-স্বরূপ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এ বিষয়ে যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে প্রথম সতীশচন্দ্র ঘোষ সংগৃহীত বরিশাল জেলায় প্রচলিত শব্দ-সংগ্রহ।[১] এর অনেক পরে ১৩৩৩ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় শব্দ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—"গ্রাম্য-শব্দ সংকলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে, কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষতঃ পল্লীসমাজে প্রচলিত শব্দনিচয়কেও গ্রহণ করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথও ১৩১১ সালে তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে[২] গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

আমি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমার জন্মভূমি খুলনা (পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত) জেলার রাড়ুলী গ্রাম ও কাটীপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে শব্দ সংগ্রহ করি। এই কাজে আমার আদর্শ ছিল স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের বই।[৩] এই বইটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু।

এই শব্দ সংগ্রহের স্থান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি রাড়ুলী গ্রাম। খুলনা থেকে স্টীমার-পথে সাতক্ষীরা লাইনে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই রাড়ুলী গ্রাম। এই গ্রামের পাশেই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মাতুলালয় কাটীপাড়া।

প্রায় একশ বছর আগে এই রাড়ুলী ও কাটীপাড়া গ্রাম লেখাপড়ায় এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে কত উন্নত ছিল, সে বিষয়ে কিছু খবর সোমপ্রকাশে[৪] প্রকাশিত হয়। আচার্য রায়ের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় একজন সে কালের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি নিজের পরিবারে এবং গ্রামের সামাজিক সংস্কারে একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় এই গ্রামে প্রকাশ্যে থিয়েটার

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৯, ২য় সংখ্যা।

২। ১৩১১ সালে 'ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে আহূত জনসভায় রবীন্দ্রনাথ পঠিত "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ"।

৩। Bihar Peasant Life by George Abraham Grierson.

৪। সোমপ্রকাশ ১২৭০।১২ জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজী ১৮৬৩।২৫ মে)

হয়। মফঃস্বল-বাংলায় প্রকাশ্যে নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই গ্রাম দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।[৫] এই থেকেই তখনকার দিনে এই গ্রামের সাংস্কৃতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁরা আমাকে এই শব্দ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের এই সুযোগে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সব শেষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীকে। তিনি তাঁর অমূল্য সময় দিয়ে এই সংগ্রহ আদ্যোপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন।

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষিকর্মে ব্যবহৃত যন্ত্র ও জিনিসপত্র সংক্রান্ত শব্দ
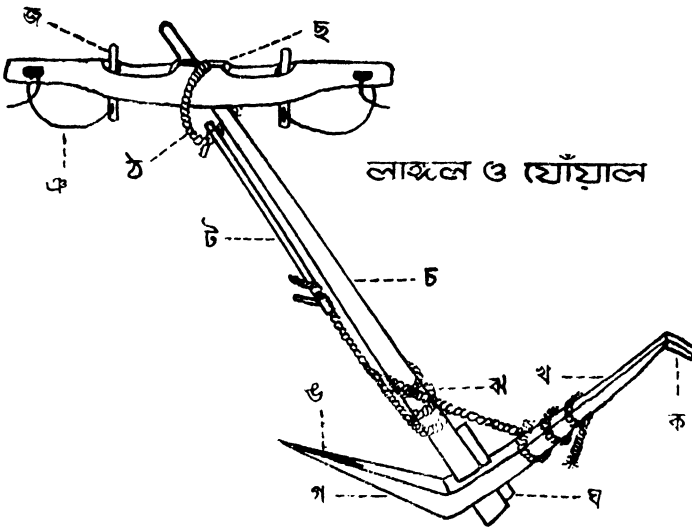
এক ॥ লাঙ্গল ও যোঁয়াল।

ক—মুঠো। খ—তাড়া। গ—গাধা। ঘ—আড়চাল। ঙ—ফাল। চ—ঈশ। ছ—যোঁয়াল, জোঙ্গাল। জ—সোমরাইল। ঝ—দড়া। ঞ—জোত, গোরুর গলার দড়ি। ট—আড়া। ঠ—নেংড়ো।

এখানকার লাঙ্গলের গঠনসৌষ্ঠব লক্ষ্যণীয়। তা ছাড়া—লাঙ্গলের ফাল কামারবাড়ী থেকে ধার দেওয়ার দরকার হয় না। লাঙ্গলের কাঠ—বাবলাই শ্রেষ্ঠ, অভাবে সুন্দরী কাঠ।

৫। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় সংস্করণ ১৩৫৪, পৃ ৬৯

যোঁয়াল—কাঠের হয়, আবার কেউ কেউ বাঁশের যোঁয়াল ব্যবহার করে—এতে খরচ কম। লাঙ্গলে, গোরুর গাড়ীতে এবং কলুর ঘানিতে গোরুর কাঁধে যোঁয়ালের নাম সর্বত্রই এক এবং গোরুর গলার দড়ি যে কাঠির সাথে আটকানো থাকে, তাও এক ; নাম—সোমরাইল।

পাচন বা পাচনবাড়ি—গোরু তাড়াইবার সরু লাঠিবিশেষ।

চাষ দেওয়া—জমি চষা। এক চাষ—জমি একবার চষা।

দুচাষ, দুয়ার, (দোরানো)—জমি দু'বার চষা।

তিন চাষ, তেয়ার—জমি তিনবার চষা।
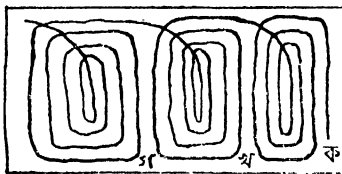
দুই॥ শিরেল ও আতর

শিরেল। আতর।—ধরা যাক, একটা জমি চাষ করা হবে। প্রথম লাঙ্গলের ফাল লাইন ধরে ভূমি কর্ষণ আরম্ভ করলো, সেই লাইনটির নাম শিরেল। যখন শিরেল-এর অংশ চষতে চষতে সেই অংশের ভিতরে গোরু দুইটির আসা যাওয়ার রাস্তা কম হয়ে আসে, সেই সময় জমির আর একটি অংশ বেড়া (বেড় দেওয়া) হয়। সেই অংশের নাম আতর। পরবর্তী প্রতি অংশের নামও আতর।

হাল—লাঙ্গল। কেউ যদি কৃষককে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কয় হালের চাষ এবং প্রশ্নকারী যদি উত্তর পায়—পাঁচ হালের চাষ, তবে বুঝিতে হইবে, কৃষকের পাঁচখানি লাঙ্গল, পাঁচ জোড়া গোরু এবং সেই পরিমাণ জমি (নিজস্ব অথবা ভাগে) আছে।

তিন॥ বাঁশোই বা মই।
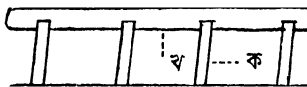
ক—কোয়া। খ—বাঁশ, পাটি।

বাঁশোই—মই[৬]।—বাঁশ হইতে প্রস্তুত।

বাঁশোই দেওয়া—জমিতে দুয়ার চাষে (দুবার চষার সময়) মাটির ডেলা ভাঙ্গিবার জন্য লাঙ্গলের পরিবর্তে বাঁশোই জুড়িয়া দেওয়া হয়।

৬। পাকা ধানে মই দেওয়া।—প্রবাদ।
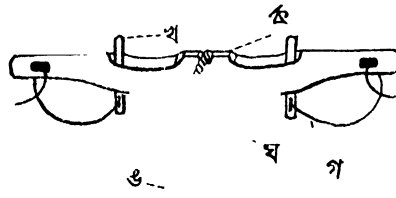
চার ॥ যোঁয়াল ও মই।
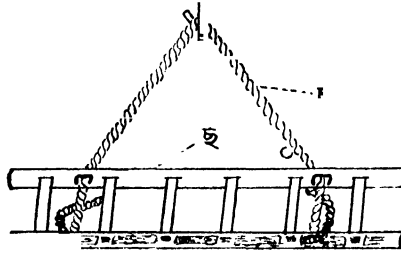
এক হালা বাঁশোই—দুইটি গোরুতে বহিবার উপযুক্ত অনধিক চার হাত লম্বা।

দু' হালা, দোহালা বাঁশোই—একবারে দুই জোড়া বা চারিটি গোরুতে বহিবার উপযুক্ত। অনধিক সাড়ে সাত হাত লম্বা।

আড়া দড়া—গোরুর গলা, যোঁয়াল ও বাঁশোই সংলগ্ন দড়ি প্রভৃতি।

পালো দেওয়া—সমস্ত জমি একবার বাঁশোই দেওয়াকে এক পালো, দুবার দু পালো, তিনবার তিন পালো দেওয়া বলে।

পাঁচ ॥ আগাছা উপড়াইবার যন্ত্রপাতি।
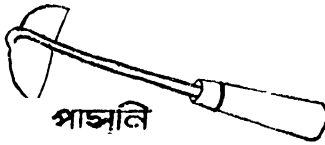
পাস্‌নি।—আগাছা উপড়াইতে ব্যবহার করা হয়।

নিংড়েন, নিড়েন। —ঐ

নিড়ানো বা নিড়েন দেওয়া—নিড়েনের সাহায্যে আগাছা উপড়ানো।

কাঁচি, হাসুয়া কাঁচি—ঘাস, আগাছা ইত্যাদি জঙ্গল কাটিতে ব্যবহার করা হয়।

কাঁচি নিংড়েন—আগাছা উপড়ানো এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনমত ছোট ছোট ঘাস কাটিবার জন্য ধারবিশিষ্ট।

জমি চ' করা—জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমি চাষযোগ্য করা।

ছয় ॥ আঁচড়া।
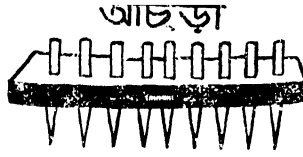
আঁচড়া—ধানের ক্ষেতের ঘাস পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত।

সাত ॥ কোদাল ও মাটি খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি।

কোদাল—জমি কোপাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

দাঁড় কোদাল—দাঁড়াইয়া কোপাইবার জন্য লম্বা হাতলবিশিষ্ট কোদাল।

হাত কোদাল—দাঁড় কোদালের ক্ষুদ্র সংস্করণ—বসিয়া এক হাতে কোপাইবার জন্য।
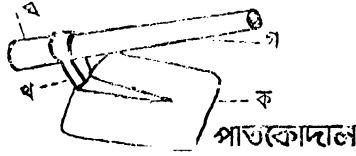
পাত কোদাল—কুঁজো হইয়া কোপাইবার জন্য।

ক—পাত। খ—পাশা। গ—আছাড় (বাঁট বা হাতল)। ঘ—মুঠো।

কোদালের এক কোপে কোদালের পাতের সঙ্গে যে পরিমাণ মাটি ওঠে, তাহাকে এক চাং বা এক চাক মাটি বলে।

খোন্তা—মাটি খুঁড়িবার জন্য। পাতলা লোহার পাত ও কাঠের হাতল বিশিষ্ট।

অনধিক দেড় দুই হাত লম্বা।

শাবোল—ঐ (সমস্তই লোহার তৈরী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক ॥ কৃষি ও গৃহস্থালীর কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জাতীয় পাত্র।

চটা—বাঁশের চেরা অংশ।

ঝুড়ি—বাঁশের বাখারি (চটা) হইতে তৈরী ছোট বড় নানা আকারের পাত্রবিশেষ।

ডালা—ঐ। মাঝারি আকারের।

শাক ধোয়া ডালা। তরকারি রাখা ডালা।—ঐ ছোট ও মাঝারি আকারের।

চাঙ্গারি—ঐ। ফলমূল রাখার জন্য।

পল (পোয়াল) কাটা ঝুড়ি—বেশ বড় আকারের ঝুড়ি। হাত দুই বা ততোধিক পরিধিবিশিষ্ট।

খারাই, খারোই, খারুই—মাছ রাখিবার গোলাকার এবং অল্পপরিসর-মুখবিশিষ্ট পাত্র।

কুলো—ধান, চাল, ডাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার পাত্র।

চালুনী—খই ঢালিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য।

ঝাঁপি—বাঁশের সূক্ষ্ম বেতি হইতে প্রস্তুত। মেয়েদের সেলাই-এর সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখিবার জন্য।

বেতি—বেতের চেরা অংশ। যাহা দ্বারা ধামা খুঁচি পালি প্রভৃতি তৈরী হয়।

খুঁচি—বেতের তৈরী। চাউল মাপার ছোট বড় নানা আকারের পাত্র। দেড় পোয়া হইতে দশ ছটাক পর্যন্ত চাউল ধরে।

পালি—বেতের তৈরী। ধান মাপার পাত্র। সাধারণতঃ পাঁচ সের ধান ধরে।

ধামা—বেতের তৈরী। ধান রাখিবার পাত্রবিশেষ।

বাধা বেতের ধামা—না চিরিয়া আস্ত বেত হইতে তৈরী ধামা। খুব বেশী রকম মজবুত হয়।

মাটি বহা ঝুড়ি—মোটা কঞ্চি বা চটা হইতে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত। বাহকের ধরিবার সুবিধার জন্য ঝুড়ির দুই পাশে দুইটি লাঠি ঝুড়ির ভিতর আটকান থাকে।

দুই ॥ কৃষি ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত সম্মার্জনী।

ঝাঁটা—নারিকেলের শলা (পাতার শক্ত শিরদাঁড়া) হইতে তৈরী। উঠোন ও অন্যান্য অপরিষ্কার জায়গা পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করা হয়।

মুড়ো ঝাঁটা, কোস্তা—ধানের খড়কুটো, গোয়াল ঘর, আদাড় (আস্তাকুড়) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বেশী অপরিষ্কার জায়গা পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ঝাঁটার আগার সরু অংশ কাটিয়া ফেলা হয়। তার ফলে ভারী জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে সুবিধা হয়।

শলা, ঝাঁটার শলা—নারিকেল পাতার শক্ত শিরদাঁড়া।

ভাজুনী শলা—মুড়ি, খই, চিঁড়ে প্রভৃতি ভাজিবার সময় ধান চাউল প্রভৃতি নাড়িয়া দিতে ব্যবহার হয়। অল্প কয়েকগাছি শলা দিয়ে তৈরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক ॥ জল সেচনের পূর্ব্বের জমি।

পড়, পিল।—জমিতে জল সেঁচিতে জমির মধ্যে নালা কাটা হয়। ইহাকে পড়, পিল বা পিলে বলে।

পোকার, পগার।—জমিতে জল সেঁচিতে জমির পাশে নালা কাটা হয়। জমির মাঝখানের নালা হইতে জল আসিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহাকে পোকার বা পগার বলে।

দুই ॥ জমির ফসল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যবহৃত ধনুক ইত্যাদি।

গুরোল
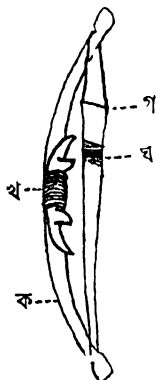
ক—গুরোল বাঁশ। খ—মুঠো। গ—তীর কাঠি। ঘ—চিনে।

গুলি—মাটির পাকানো ছোট ছোট মার্বেলের মত। রৌদ্রে শুকাইয়া বা আগুনে পোড়াইয়া শক্ত করা হয়। পরে গুরোলবাঁশের সাহায্যে দূরের গোরু, বাছুর এবং পাখী প্রভৃতি তাড়ানো হয়।

কাকতাড়ুয়া—খড় ও বাঁশের চটাদ্বারা বিশ্রীভাবে তৈরী একটা মানুষের মূর্তি জমিতে রাখা হয়। অথবা মরা গোরু মহিষের মাথার খুলি একটি বাঁশের মাথায় টানাইয়া রাখা হয়। ইহা দেখিয়া হনুমান বাঁদর প্রভৃতি জমিতে আসে না।

কালো হাঁড়ি—লাউ কুমড়োর মাচায় রাখা হয়—যাহাতে প্রতিবেশীর কুদৃষ্টির ফলে গৃহস্থের লাউ কুমড়া নষ্ট না হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক ॥ ধান কাটিবার যন্ত্রপাতি।

ধারো কাঁচি—ধান কাটিবার জন্য বিশেষ ধারওয়ালা কাঁচি।

আছাড়, বাঁট—হাতল। কাঁচির যে জায়গা কাঠের তৈরী এবং ধান কাটিবার সময় হাত দিয়া ধরা হয়।

পাত—কাঁচির ফলা বা লোহার চ্যাপ্টা অংশ।

দাঁত—পাতের বা ফলার আগায় দাঁতের মত কাটা কাটা অংশ—যাহার ধারে ধান কাটে।

দুই ॥ ধান কাটা মজুর।

দাওয়ালে—কেবলমাত্র ধান কাটার জন্য মজুর সম্প্রদায়।

দাওয়ালের আঁটি—দাওয়ালের সহিত ফুরন অনুসারে তাহার ভাগ—সাধারণতঃ প্রতি কুড়ি আঁটি ধানে এক হইতে তিন আঁটি পর্যন্ত ইহাদের প্রাপ্য হয়।

ফুরণ—চুক্তি।

তিন ॥ খামারে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও অন্যান্য বিষয়।

খামার—ধান রাখা এবং ধান গোরু দ্বারা মলিবার (ছাড়াইবার) উঠোন।

পালা দেওয়া—ধানের আঁটিগুলি এক জায়গায় সাজাইয়া বা পালা দিয়া রাখা হয়।

মলন—গোরু দ্বারা ধান ছাড়ানো-কাজ।

মলা—ধান মাড়ানো।

মলনের নিয়ম।—উঠানের মাঝখানে কাঠের বা বাঁশের একটি খুঁটি পোতা হয়। ঐ খুঁটিকে মেই (বা মূল) বলে। ঐ খুঁটি পোতা উপলক্ষ্যে খুঁটির গোড়ায় কাঁচা দুধ ধান দূর্বা দেওয়া হয়। পরে যে কয়টি গোরু (সাধারণতঃ ৫।৬টি) ঘুরিয়া ধান মাড়াইবে ততখানি স্থানে ধানের আঁটি ছড়াইয়া রাখা হয়। তারপর একটি দড়ি আনা হয়—নাম মলন দড়ি। দড়ির গায়ে ৫।৬টি গোরুর গলা আটকানো যায় এমন ভাবে ফাঁস এবং গোরুগুলি পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে এমন দূরত্ব অন্তর ঐ ফাঁসগুলি থাকে। পরে গোরুগুলি বাঁধিয়া একজন লোক তাড়াইতে থাকে। ফলে গোরুর পায়ের চাপে ধান পড়িতে থাকে। উপরোক্ত মূল খুঁটির প্রথমেই যে গোরুটি থাকে তাহাকে মেই গোরু এবং সব শেষে যেটি থাকে তাহাকে ধারের গোরু বলে।

মলন দড়ি ও মেই খুঁটি—এইভাবে সাজান হয়—

খুঁটি | —দড়ি (১ মেই গোরু) —দড়ি (২ গোরু) — (৩ গোরু) — (৪ গোরু) — (৫ গোরু) — (৬ ধারের গোরু)

ধান মলিবার সময় গোরু যাহাতে ধান খাইয়া ধান ও সময় নষ্ট না করিতে পারে সে জন্য গোরুর মুখে বাঁশের বেতী হইতে তৈরী ছোট ডালা জাতীয় আবরণ দেওয়া হয়। নাম ঠুসি বা ঠুলি। ইহার দুই প্রান্ত গোরুর গলার দড়ির সংগে যুক্ত থাকে। মলন শেষে গোরুর ঠুসি খুলিয়া দেওয়া হয়—খড় খাইবার জন্য।

কাঁতুলি—বাঁশের তৈরী। ইহার আগা আঁকশির মত—ইহার সাহায্যে ধান মলা শেষে পোয়ালগুলি টানিয়া আলাদা করা হয়।
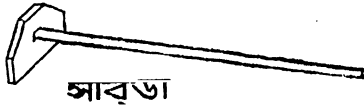
সাবড়া—মলন শেষে ধান গোটো (একত্র বা জড়ো) করিবার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের তৈরী। আগায় কাঠের তক্তা লাগানো।

ধানে বাতাস দেওয়া।—একটি পরিষ্কার জায়গায় কুলোর সাহায্যে ধান মাটিতে ফেলা হয়। ফলে বাতাসে ধানের খড়কুটো ইত্যাদি হালকা ময়লা উড়িয়া যায়। তারপর পোয়াল (পল) দিয়ে পাকানো বোড়ের সাহায্যে কুলো ধরিয়া উল্টাপিঠ দ্বারা বাতাস দেওয়া হয়। ফলে ধানের ভিতরকার মাটি ইটের কুচি ইত্যাদি ভারী ময়লা এবং ধানের চিটে (চিটা—শাঁসহীন ধান) পরিষ্কার হইয়া যায়।

এরপর ধান মাপা আরম্ভ হয় এবং ভাগরা (ভাগীদার) চাষীর সহিত সর্ত (সাধরণতঃ মোট ধানের ১।৩, ১।৪ বা ১।২ যা হোক) অনুসারে ভাগ করা হয়। প্রথমে পছন্দমত ভাগ গৃহস্থ ডাকিয়া নেয়।

চার ॥ গোলা বা ধান রাখার পাত্র।

গোলা—ধান রাখিবার জন্য স্থায়ী ঘর। গোলাকার বেড়যুক্ত, তাই গোলাঘর নাম। উপরে গোলপাতার ছাউনী এবং একেবারে মাথায় নাদা (মাটির তৈরি গামলা) বসানো।

ভিত—ভিত্তি—যাহার উপর গোলার পায়া বা পোঠে স্থাপিত।

পায়া, পোঠে—৪।৬।৮ বা ততোধিক যে পায়ার উপর গোলা স্থাপিত।

আউড়ি—বাঁশের চটা হইতে তৈরী। ঘরের ভিতরে ধান রাখা এবং পাড়িবার (নামাইবার) সুবিধার জন্য মাথা খোলা। ভিতর দিকে গায়ে কাদা ও গোবর দিয়ে লেপা। সাধারণতঃ ৩০ হইতে ৫০ মন পর্যন্ত ধান ধরে।

ডোল—ঐ ছোট।—অর্ধ ডিম্বাকৃতি। ১৫।২০ মন ধান ধরে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক ॥ গোরুর খাওয়ার পাত্র ও পল কাটা বোঠি।

নাদা, নাদ—গোরুর খাওয়ার জন্য মাটির পাত্র।

গড়া ১—বাঁশের চটা দিয়ে গোলাকারে বোনা। উপরে বড় আকারের নাদা বসান থাকে—ফ্যান-জল, কুঁড়ো-জল এবং খোলভুসি ইত্যাদি গোরুর খাবার দেবার জন্য।

গড়া ২—ঐ। ইহাতে কোন পাত্র থাকে না।—ঘাস পল বিচুলি জাতীয় গোরুর খাবার দেবার জন্য। (দেখিতে অনেকটা রাস্তায় গাছের চারা ঘিরে রাখার জন্য খাঁচার মত)।

পল—পোয়াল। ধানের শীষ হইতে ধান বাদ দিলে যে অংশ বাকী থাকে।

পল কাটা বোঠি—বিচালি কাটা বোঠি। ইহার পাত করাতের মত উল্টা ধারবিশিষ্ট।

বোঠির কাঠ বা আছাড়—যে মোটা কাঠের উপর বোঠি খাড়াভাবে বসানো থাকে।

দুই ॥ গোরু ছাগল প্রভৃতি তাড়াইবার লাঠি ইত্যাদি।

পাচন, পাচনবাড়ি—গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি।

কচা—জিউলি বা জিওল গাছের ছোট ডাল।

ঠ্যাঙ্গা—আবড়ো-খাবড়ো (আবুড়া-খাবুড়া) শক্ত লাঠিবিশেষ।

ঠ্যাঙ্গানো—ঠ্যাঙ্গা দ্বারা আঘাত করা।

লগা—৬।৭ হাত লম্বা বাঁশের আগা হইতে তৈরী। অল্প উঁচুতে অবস্থিত গাছ হইতে ফল পাড়িতে ব্যবহার হয়।

আংশো—আঁকশি। মাঝারি এবং বড় আকারের লগা।

তিন ॥ বদমাইশ গোরু জব্দ করিবার জিনিসপত্র।

তেকাঠা—যে তিনটি কাঠ বা বাঁশ দিয়ে ঘিরে গোরুকে আটকে রাখা হয়।

ছাঁদা—ছাঁদন দড়ি দিয়ে গোরুকে বাঁধা।

ছাঁদন দড়ি[৭]—ছাঁদার সময় যে দড়ি দিয়ে গোরুকে বাঁধা হয়।

ঠেকো—তেকাঠার ভিতরে একখণ্ড কাঠ বদমাইশ গোরুর গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে গোরুটি সামনের দিকে চলিতে না পারে বা মাথা নাড়িয়া মানুষকে গুঁতাইতে না পারে।

চার ॥ গোরু বাঁধা এবং অন্যান্য জাতীয় দড়ি সূতা ইত্যাদি।

দিগড় দড়ি—যে দড়ি দ্বারা গোরু-ছাগলকে একটি খুঁটোর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়—সীমাবদ্ধ জায়গায় চরিবার জন্য।

ছাঁদন দড়ি[৭]—(পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

তড়কা—পাল (পোয়াল বা বিচালি) বা ঘাস পাকাইয়া ধানের বা ঘাসের আঁটি বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত দড়ি।

দড়া—পাট হইতে প্রস্তুত বেশ মোটা দড়ি। দুই হইতে পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত পরিধিবিশিষ্ট। নৌকা ইত্যাদি বাঁধিবার জন্য।

"আস্তে আস্তে দেওান তখন গোয়ালে যায় হেঁটে।
পানাইল বাঝো গাই ছাঁদন দড়ি এঁটে।"

—মৎ-সংগৃহীত ও আলোচিত 'মানিকপীরের গান' প্রবন্ধ, পরিক্রমা ১৩৬৩ বৈশাখ।

ঐ ছোট—পাটের সুতা হইতে তৈরী। নারিকেল এবং কাঁঠাল পাড়িবার জন্য ব্যবহার হয়।

কাতা—নারিকেলের ছোবড়া হইতে প্রস্তুত।

তাঁতো, সুতুলী—যথাক্রমে পাট এবং তুলার খে হইতে পাকানো সরু দড়ি।

টাকু এবং পাট টাকুর—যথাক্রমে সুতুলী এবং তাঁতো জড়াইয়া রাখিবার জন্য। কাঠের তৈরী।

মোড়োন দড়ি—গাড়ীর মাঝামাঝি অংশে একটি কাঠির সাহায্যে পাক দিয়া গাড়ীর বাতাকে শক্ত (মজবুত) রাখিতে ব্যবহৃত দড়ি। ('গোরুর গাড়ী' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

নেংড়ো, দড়া, জোত—('লাঙ্গল ও যোঁয়াল' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ধাগা—লেপ, কাঁথা বা অন্য কোন ছেঁড়া জিনিস সেলাই করিবার মোটা সুতা।

খে (খিয়ে) বা তার—এক পাক সুতা।

পাঁচ ॥ চট হইতে প্রস্তুত জিনিস।

ছালা—বস্তা।

চট—পাটের সুতা হইতে বোনা মোটা কাপড়।

থলে—ছোট এবং মাঝারি আকারের বস্তা। পাটের তৈরী।

থতে—বাজারের থলি।

গাঁজিয়া, গেঁজে—ব্যবসাদারের ট্যাঁকে (কোমরে) গোঁজা থাকে। টাকা পয়সার থলি।

ছয় ॥ গোরুর-গাড়ী

ক—বেড়ের কাঠ। চাকার পরিধির অংশ। খ—পায়া বা পায়ের কাঠ।

গ—ঝুরো। বাব্‌লা অথবা সুন্দরী কাঠের তৈরী। ঘ—পাশের খিল। চাকার বাহিরে ইহা দ্বারা ঝুরো আটকানো থাকে। ঙ—খিল। বেড়ের কাঠ (ক)—এর সহিত পায়া

(খ) আঁটিবার জন্য। কাঠের তৈরী। চ—ঘোড়া কাঠ। ছ—ডাবের বাঁশ। জ—যোঁয়াল। ঝ—সোমরাইল। ঞ—শিঙড়। যোঁয়াল (জ) এর পরে যেখানে ডাবের বাঁশ (ছ) দুইটির মাথা মিশিয়া থাকে। ট—মোড়োন কাঠি। ঠ—মোড়োন দড়ি। ড—(জ-এর) উপরের বাঁশ। ঢ—হাঁড়ে' (হেঁড়ে)।—যার ভিতর ঝুরো (গ) থাকে। ণ—উলো। —লৌহ বলয়। ঝুরো (গ) এর লম্বা অংশটির যাওয়ার ছিদ্র হাঁড়ে' (ঢ) এর মুখের লৌহবলয়—নাম উলো (ণ)।

আল—চাকার বাহিরে ঝুরোর ৫।৬ আঙ্গুল পরিমাণ অংশ।

হাল—চক্র পরিধির লোহার বেষ্টনী।

ডাবা—বোঝার ভারে গাড়ীর সামনের দিক ঝুঁকিয়া যাওয়া।

ওলা, ওলার—বোঝার ভারে গাড়ীর পিছন দিক ভারী হওয়া।

পোকার, পো'ট (পোইট)—গাড়ীর যাতায়াতের পথে চাকাব দাগ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

এক ॥ ঢেঁকি।—ধান হইতে চাউল প্রস্তুত কবিবার জন্য।
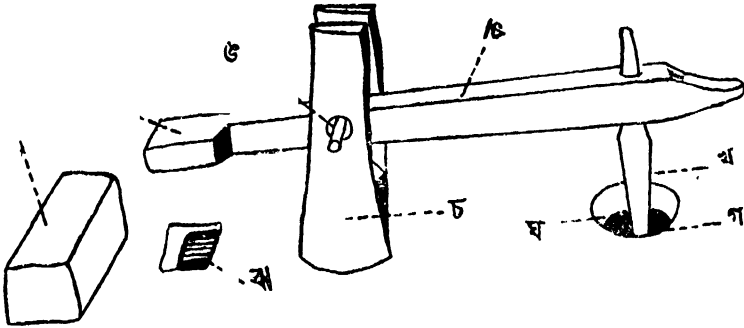
ক—ঢেঁকি। খ—ছে। গ—গুলো। ছে-র আগার লৌহবলয়।

ঘ—লোট। ঙ—তরশাল। চ—পই। নারিকেল বা খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি।

ছ—পাছা, পাছতলা। ঢেঁকির পশ্চাদ্ভাগস্থ অংশ—যেখানে পা দিয়া পার বা পাড় (চাপ) দেওয়া হয়। জ—পোঠে।—দাঁড়াইবার জায়গা। ঝ—পার দেওয়ার ফলে ঢেঁকির পাছা যেখানে গিয়া ঠেকে।

লোট—(চিত্রের ঘ অংশ) যাহার ভিতরে ধান বা চাউল থাকে।

তরশাল[৮]—(চিত্রের ঙ অংশ) যাহার আঘাতে ধান বা চাউল কুটা হয়।

[৮] ঢেঁকির তরশাল!—প্রবাদ। (অর্থাৎ নিরুপায়।—আমি এখন ঢেঁকির তরশাল! ঢেঁকিতে যেমন ঘা দেবে তেমন সহ্য করতে হবে!)

ধান ভানা৯ বা কুটা—ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করা।

আ'লে বা এলে (এলিয়ে) দেওয়া—লোটের ভিতরকার ধান মাঝে মাঝে হাত দিয়া নাড়িয়া দেওয়া।

আড়—পোঠের দুই পাশে দুইটি চার-পাঁচ হাত লম্বা বাঁশ খাড়াভাবে বসানো থাকে এবং আর একখানি বাঁশ ঐ দুইখানি বাঁশের খুঁটির উপর আড়াআড়ি ভাবে বসানো থাকে। ইহাকে আড় বলে এবং ইহার উপর দুই হাতের ভর দিয়া স্ত্রীলোকেরা ঢেঁকিতে পাড় দেয়।

গড়
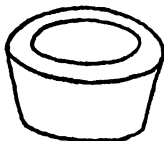
গড়—ধানে পাড় দেওয়ার ফলে লোট হইতে চাউল ছিটকাইয়া বাহিরে না যাইতে পারে সেই জন্য মাটির তৈরী পোড়ানো গোলাকার উপরে নীচে খোলা গড়, লোটের উপর বসানো থাকে।

ধানে এক পালটা দেওয়া—প্রথম বার ধানে পার দেওয়া। ইহাতে ধান হইতে চাউল বাহির হয় কিন্তু বেশ কিছু ধান থাকিয়া যায়।

ধানে দুই পালটা দেওয়া—দ্বিতীয়দফায় ধানে পার দেওয়া।—প্রয়োজন অনুযায়ী তিন চার পালটাও দেওয়া হয়।

কাঁড়ানো—উক্ত দুই পালটা দেওয়া চাউল কুলোর সাহায্যে পরিষ্কার করা।

কোন বা চালের আগা—কাঁড়ানোর সময় কুলোর উপরে মাঝেখানে জমান চাউলের খুব ছোট, ভাঙ্গা অংশ।

কাঁড়া চাল—কাঁড়ানোর সময় কুলোর মাঝখানে যে পরিষ্কার চাউল থাকে।

ম'লকো (মইলকো)—কাঁড়ানোর সময় কুলোর আগায় যে ধান ও ময়লা থাকে।

ম'লকো করা—চালকে ভালভাবে ময়লাবিহীন করা।

কাঁড়া১০—পরিষ্কার। আঁকাড়া—অপরিষ্কার।

ধান ভানুনি বা ভানানী—যে স্ত্রীলোক (—সম্প্রদায়) ধান ভানিয়া জীবিকার্জন করে।

দুই॥ যাঁতা।—ডাউল ও কলাই ভাঙ্গিবার জন্য।

চাকি—উপরে ও নীচে যাঁতার দুইটি পাথরের চাকা বা চাকী (চক্র) থাকে।

খিল—ছোট এক বিঘৎ পরিমাণ কাঠের তৈরি কাঠি। দুই চাকির মধ্যস্থলের ছিদ্রে থাকিয়া চাকি দুইখানিকে আটকাইয়া রাখে।

---

৯ ধান ভানতে শিবের গীত।—প্রবাদ।

১০ ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।—প্রবাদ।

কাঠি—যাঁতার উপর-চাকির উপরিভাগে একটি অল্প গভীর ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রে সুবিধা মত লম্বা একখানি লাঠি আটকাইয়া হাত দিয়া ঘোরানো হয়। ফলে চাকি ঘুরিতে থাকে এবং ডাল কলাই ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া যায়। ('যাঁতা ঘোরে হাতের জোরে')।

পিঁড়ি—কাঠের এক হাত বা প্রয়োজনানুযায়ী ছোট বড় বিনা পায়ার তক্তা। ইহার উপর বসিয়া স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর প্রায় যাবতীয় কাজ করে।

তিন ॥ দুগ্ধ মন্থনের সরঞ্জাম।

ময়া (মন্থন) কাঠি—ঘোল টানা বা মন্থন করিবার কাঠি। বাঁশের তৈরী। দুইজনে টানিবার জন্য। ছুরি কাঁচি শান দিতে যেমন দুই জনে বসিয়া একটি দড়ির দুইপ্রান্ত ধরিয়া টানে ময়া কাঠি তেমন দাঁড়াইয়া দুই জনে টানে। কাঠির এক অংশ ছেঁচা থেঁৎলানো। সেই অংশ পাত্রের ভিতরে দুধ বা ঘোলের মধ্যে ঢোকানো এবং অপর অংশ পাত্রের উপরে বাহিরে থাকে। দড়িটি তাহাকে জড়াইয়া থাকে। দড়ির দুইপ্রান্ত ধরিয়া টানিবার সময় পাত্রটি যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেইজন্য ঐ বাঁশের গায়ে বেতের বা বাঁশের চটার বেষ্টনী পাত্রের মুখে বেড় দেওয়া থাকে। ফলে কাঠিটি পাত্রের ঠিক কেন্দ্রে ঘুরিতে থাকে।

বেশালি[১১]—দুধ রাখিবার বড় পাত্র।

কাঁড়ে, কেঁড়ে—দুধ দোহাইবার এবং রাখিবার পাত্র।

ত'লো (তইলো)—দুধ রাখিবার বড় হাঁড়ি।

বৈয়েম—ঘি, মাখন রাখিবার পোড়া মাটির বা কাচের পাত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত মাটির ও কাঠের জিনিস পত্রাদি।

এক ॥ মাটির তৈরি বিভিন্ন আকারের পাত্র।

(শব্দসংগ্রহ—দ্বিতীয় ভাগ—'কুমোর' পরিচ্ছেদে আলোচ্য)।

দুই ॥ কাঠের তৈরি বিভিন্ন আকারের পাত্র।

তেপায়া—হ্যারিকেন ইত্যাদি রাখার জন্য সমতল ও তিনপায়াবিশিষ্ট। কতকটা 'টিপয়' এর ক্ষুদ্রতম সংস্করণ।

বারকোষ—কাঠের বড় ছোট মাঝারি থালা। পূজার নৈবেদ্য প্রসাদ ইত্যাদি এবং ময়রার দোকানে খাবার জিনিস ইত্যাদি রাখিবার জন্য।

১১। 'বেশালি পোরা আছে দুগ্ধ হাঁড়ি পোরা দই।'—মৎ-সংগৃহীত ও আলোচিত 'মানকপীরের গান' প্রবন্ধ। 'পরিক্রমা' ১৩৬৩ বৈশাখ।

কাঠকো—গামলা ও বাটির আকারের কাঠের তৈরী পাত্র।

দেলকো—প্রদীপাধার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাদুর জাতীয় বসিবার আসন

মাদুর—মালে' (মালিয়া, মেলে') হইতে বোনা।

শপ—লম্বা মাদুর। একবারে অনেক লোক—২০।২৫ হইতে ৫০।৬০ জন লোক—বসিতে পারে। গ্রামাঞ্চলে গান বাজনা ইত্যাদি উৎসব এবং নিমন্ত্রণের সময় বসিতে দেওয়া হয়।

তাড়া মাদুর—খুব ছোট, একজন কিংবা দুজন বসিবার জন্য। গ্রামাঞ্চলে প্রথম পড়ুয়া এই রকম তাড়া মাদুর বগলদাবা করিয়া পাঠশালায় যায়।

পাটী—খেজুরের শুকনো পাতা হইতে বোনা।

পাটা—পাটীর এক একটী বোনা অংশ। এই রকম বোনা অংশ জুড়িয়া জুড়িয়া সম্পূর্ণ পাটী হয়।

জো তোলা—পাটী প্রথম বুনিতে আরম্ভ করা।

তাড়া পাটী—তাড়া মাদুরের মত।

চাটনা বা চাটাই—তালপাতা হইতে প্রস্তুত বসিবার আসন।

যুঙ্গুড়, টোকা—চাষীদের প্রয়োজনীয়, জলনিবারক মাথার আচ্ছাদন।

শীতলপাটি[১২]—ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক; গরম কালে শোবার জন্য ব্যবহৃত। নদীর ধারে জাত একরকম নলগাছের ছালের বেতি হইতে তৈরী। (বরিশাল, খুলনা ও ২৪ পরগনার নিম্নাঞ্চলে এইজাতীয় নলগাছ দেখা যায়।)

নবম পরিচ্ছেদ

জিনিসপত্র ও লোকজন বহিবার যানবাহন।

এক ॥ গোরুর-গাড়ী।

"গোরুর-গাড়ী" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) দ্রষ্টব্য।

দুই ॥ পাল্কী।

বিবাহে বা অসুস্থ অবস্থায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে গ্রামাঞ্চলে পাল্কী সম্ভ্রান্তরকমের বাহন। পাল্কীর আকার (ছোট বড়) অনুসারে ৪।৬ বা ততোধিক লোকে উহা কাঁধে করিয়া

---

১২ হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।

তাহার অধিক হিম কণ্ঠে, তোমার বুকের ছাতি।

—লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫৯ আশ্বিন সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ ৩০।

লইয়া যায়। 'কাহার'[১০] ('কাওরা' শ্রেণীর লোক) বা 'বেহারা' সম্প্রদায়ের (মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু) লোকেরাই পাল্কী বাহক। বিবাহে পাল্কীবাহকেরা এক রকম গান করে।[১৪]

তিন ॥ নৌকা।

জলপথে গ্রামান্তরে যাইতে নৌকাই একমাত্র সুলভ বাহন। জেলে ডিঙ্গি, টাপুরে নৌকা, গহনার নৌকা, বজরা, বোট ইত্যাদি অনেক রকম নৌকা আছে।

গোলপাতা-ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত 'গোলের নৌকা', ধান-চাল ও পাট ব্যবসায়ীদের জন্য ধানের নৌকা, পাটের নৌকা ইত্যাদি।

নৌকার বিভিন্ন অংশের নাম ও আলোচনাজন্য "শব্দসংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ 'মাঝি' পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১৩ 'সাত মিন্‌সে কাহার দেব দুলান দুলাতে'—ছেলেভুলানো ছড়া - লোকসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৯ আশ্বিন, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬২।

১৪ "বিবাহের সময় পুরুষদের মধ্যে যাহারা গান গায়, তাহারা পালকীর বেহারা।"—হারামাণ, মুঃ মনসুরউদ্দীন, ১৯৪২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩।৵০।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শেষ-

বিশেষে তাহাতে আমি কৈল অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার॥
মোর হাথে পরলোক ধনঞ্জয় পায়।
নহে অর্জ্জুনের হাথে মোর মৃত্যু প্রায়॥
এই পণ কৈল আমি সভা বিদ্যমানে।
সত্যে ভ্রষ্ট হইতে মা নারি কদাচনে॥
তেকারণে জননি ক্ষমা করহ আমারে।
এত শুনি কুন্তী পুনঃ করিল উত্তরে॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না করিবে মিলন।
মোর বাক্য যদি নাঞি করিবে পালন॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে॥
এত শুনি কর্ণ সত্য কইল অঙ্গীকার।
আর চারি ভাইরে নাহি করিব প্রহার।
ভাই২ বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
জে চিত্তে আইসে তাহা করহ রাজন॥

ভণিতা—

জয় প্রভু নীলাম্বর নীলকণ্ঠধারী।
নমো বৌদ্ধ অবতার দারুরূপ হরি॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
তাঁহার চরণ চিন্তি কহে কাশীদাস॥

শেষ—

সূর্য্যের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
সেই ক্ষণে তোমা প্রসবিলুঁ মহামতি॥
প্রসবিয়া তোমারে চিন্তিলুঁ আমি মনে।
অকুমারী কালে জন্ম হইল নন্দনে॥
লোকে জ্ঞাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইলু তাম্রপাত্র আনি॥
রাধায় পাইয়া তোমা করিল পালনে।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দনে॥

৬৫৭। **মহাভারত- উদ্‌যোগপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৫-৩৯, ৪১-৬৯, ৭৬-৮৬, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। হস্তাক্ষর ভাল। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পঞ্চদশ পত্রের আরম্ভ—

সংপ্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে আপার।
এই মত বৈল রাজা ইন্দ্রের কুমার॥
সহদেব নকুল বলিলা বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি জত নৃপবর॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ জে হয়।
তাহা দিয়া সন্তোষহ পাণ্ডুর তনয়॥

৬৫৮। **মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২, ৪-৯, ১২-৪৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৫ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ॥
বিরাট নগরে দেহ দূত পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে আনহ হেথা কপট করিয়া॥
সেনাপতি মুখ্য ২ জত বীরগণ।
সঙ্গেতে সভাই জেন থাকে অনুক্ষণ॥
বিরাট দ্রুপদ আদি ভাই পঞ্চ জন।
ভোজন করাহ রাজা করি আমন্ত্রণ॥

সূপকারগণ সঙ্গে…করহ।
অন্ন সনে বিষপান সভারে করাহ॥
বিষপানে হীনবল হব সর্ব্বজন।
জতেক প্রহারি লোকে করিব নিধন॥

ভণিতা—

শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কিছু কাশীরাম কয়॥

শেষ—

হেন কালে বিদুর আইল নিজালয়।
কান্ধে হৈতে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে এড়য়॥
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকীনন্দন।
ভাবে তদ্‌গতচিত্ত অশ্রুত লোচন॥
আমার ভাগ্যের সীমা বর্ণিতে না পারি।
কৃপা করি মোর গৃহে আল্যা শ্রীহরি॥
কিবা দ্রব্য দিয়া পূজা করিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাহি ঘরে॥
বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত।
খেমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া দুখিত॥
এত বলি দণ্ডবৎ কৈল নানা স্তুতি।
নমো ২ পূর্ণব্রহ্ম জগতের পতি॥

যে আদর্শ দেখিয়া লিপিকর পুথি নকল করিয়াছেন, সেই আদর্শে এই পর্য্যন্তই ছিল এবং পরে অন্য আদর্শ পাইলে তিনি অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া দিবেন, এই কথা বলিয়া লিপিকর লিখিতেছেন,—

ইতি সন ১২৪৫ সাল ২১ মাহ ফালগুন রোজ শনিবার বেলা আন্দাজি আড়াই প্রহরের সময় তৈয়ার হইল তিথি কৃষ্ণপক্ষ দুতিয়া লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ সাধু এই পুস্তকের অধিকার এবং মালিক শ্রীযুত বলাইচাঁদ মোদী সাং গলিজোড়ি॥

৬৫৯। মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১, ৩২-৫৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৫৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭০৪ শকাব্দ। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

অথ উতজোগপর্ব্ব লিখ্যতে॥

জন্মেজয় কহে শুন মুনি তপোধন।
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন॥
তদন্তরে কি করিলা পিতামহগণ।
আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ॥
কোন দূত পাঠাইব হস্তিনা নগরে।
ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন বুঝাবার তরে॥

ভণিতা—

উদযোগ পর্ব্বের কথা ব্যাসের রচিত গাথা
কাশীরাম দাস বিরচন॥

শেষ—

না ভাবিহ দুঃখ মাতা জাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ হইলা চরণে॥
বিদায় হইঞা কর্ণ গেলা নিজ পুরে।
নিজ স্থানে গেলা কুন্তী দুঃখিত অন্তরে॥
পুণ্যকথা ভারথের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারথ পুরাণ॥
জেবা পড়ে জেবা কহে করএ স্মরণ।
সর্ব্বদুঃখ হরে তবে পাপ বিমোচন॥
কাশীরাম দাস কহে ভারথের মত।
এত দূরে উদযোগপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৭০৪ তারিখ ১ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দশমী॥ শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং। পাঠার্থং॥

৬৬০। **মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। প্রথম পত্রের দক্ষিণ অংশের খানিকটা নাই। পরিমাণ ১৩।০×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

অথ উতজোগ পর্ব্ব লিক্ষতে॥

জন্মেজয় কহে তবে শুন তপোধন।
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন॥
তদন্তরে কি করিল পিতামহগণ।
......আপনা রাজ্য পাবার কারণ॥

ভণিতা—

উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সাধু সদা করে পান॥

৬৬১। **মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৫-১৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫॥০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পূর্ব্বে ৬৫৯ সংখ্যক উদ্‌যোগপর্ব্ব পুথির যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই ১৪টি পত্র সেই পুথির প্রথম অংশের বলিয়া মনে হয়। ভণিতা—

উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

৬৬২। **মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৪৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৪ সাল

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ॥ গণেশায় নমঃ॥

জন্মেজয় বলে কহ মুনি মহাশয়।
তব মুখে শুনি বড় আনন্দ হৃদয়॥
কিরূপে হইল যুদ্ধ কার কত সৈন্য।
কহিতে লাগিলা মুনি বলি ধন্য ২॥

শেষ—

ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা কহিলা সঞ্জয়।
ভীষ্মের পতন হইল শুন মহাশয়॥
শিখণ্ডী সহায় করি মাইল পার্থ বীর।
শরশয্যায় আছে প্রাণ না হয় বাহির॥
উত্রায়ন হইলে ভীষ্ম তেজিবেন প্রাণ।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হৈল কম্পবান॥
ভীষ্মের পতন শুনি কুরুনরপতি।
হা হা ভীষ্ম বলি পড়িলেন ক্ষিতি॥
... ...
মহাভারতের কথা শুনিলে পবিত্র।
কাশী কহে ভীষ্মপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীতারাচাঁদ রক্ষিত সাঃ দেবগ্রাম পরগনে সাহাবাদ সন ১২৪৪ বার সও চৌতালিষ সাল তারিখ ২৮ কার্ত্তিক শনিবার বেলা এক প্রহরের সময় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কোঙারের বাহিরবাটীর পূর্ব্বদ্বারি ঘরের পীড়ায় উত্তর দিগে পূর্ব্বমুখে বসিয়া লিখিলাম এবং সমাপ্ত করিলাম ইতি।

৬৬৩। **মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৸০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫১ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

অথ ভীষ্মপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

তবে জন্মেজয় বৈল শুন মুনিরায়।
হইল ভারথযুদ্ধ কহ কি ধারায় ॥
তবে কোন কর্ম্ম কৈলা দুর্য্যোধন বীর।
কহ কি করিলা তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কোন২ বীর আল্য সংগ্রাম ভিতরে।
প্রত্যক্ষে বিশেষ করি বলহ আমারে ॥

ভণিতা—

কমলাকান্তের স্থত কাশীরাম নাম।
পরগনে ইন্দ্রায়নি সিঙ্গে জার ধাম ॥

শেষ—

এত শুনি বিদায় করিল সর্ব্বজন।
শিবিরেতে গেলা কুরু পাণ্ডবনন্দন ॥
শরশয্যা করি ভীষ্ম তথায় রহিল।
ভীষ্মপর্ব্বকথা এই সমাপ্ত হইল ॥
জয় প্রভু নীলকণ্ঠ নীলগিরিধারি।
নম রুদ্র অবতার দারুরূপে হরি ॥
এক প্রভু তিন বর্ণ নীলাচলে বাস।
জেই মুখচন্দ্র তিন শ্রবণ প্রকাশ ॥
... ...

ইতি ১২৫১ সাল তারিখ ২ আসার ভিষ্ম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। এ পুস্তক শ্রীভুবনচন্দ্র কুণ্ডু সাঃ দেনোড় সহস্তের লিখন ॥ রোজ মঙ্গল বার তিথি কৃষ্ণ পক্ষ আমাদের নিজ বাসাতে বসিয়া সমাপ্ত করিলাম ইতি ॥

৬৬৪। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৬, ২৮-৩৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। একাধিক পত্রের কিছু কিছু অংশ এবং শেষ পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। পরিমাণ ১১×৩৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নমঃ ॥

ভিস্ম পর্ব্ব লিক্ষতে।

জন্মেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর।
উলুক কহিল গিয়া সকল উত্তর ॥
তবে কোন কর্ম্ম কৈল দুর্য্যোধন বীর।
কোন কর্ম্ম কৈল তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥

ভণিতা—

ভীষ্মপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

শেষ—

আমার ইহাতে যুক্তি পরিহরি ক্রোধ।
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ না কর বিরোধ ॥
ভীষ্মের বচন ... ... র্য্যোধন।
রাজা সহ চলি গেলা জার জে ভুবন ॥
কর্ণ বীর আসিয়া ভীষ্মেরে সম্ভাষিল।
... ... পর্ব্ব সাঙ্গ হইল।

ইতি ভিস্বপর্ব্ব সমাপ্তঃ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ হাজরা সাং পাচথোপী পরগণে...তারিখ ১৮ আসাড়।

৬৬৫। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৩-২৩, ২৫-৩৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। একাধিক পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৸০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ—

পাণ্ডব কৌরব তবে নির্ণয় করিল।
ধর্ম্ম অনুসরি বুঝি নিয়ম করিল ॥
নিকট হইল যুদ্ধ দেখ [বিদ্যমান]।
ধর্ম্মহিত বুঝি সভে করহ বিধান ॥

গদাযুদ্ধ হব তবে পদাতি২ ।
রথে২ যুদ্ধ হয় ধর্ম্মেতে খেয়াতি ॥
বিনা বচাবচে যুদ্ধ নহিব দুর্ব্বার ।
আসোয়ার সহ যুদ্ধ করিব আসোয়ার ॥
একের সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে ।
না মারিব সৈন্যগণে বৈমুখ জে জনে ॥
বৃদ্ধ জনে না মারিব না মারিব সুত ।
হীনে অস্ত্র না মারিব না মারিব দূত ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।
চতুর্থ দিনের যুদ্ধ হইল সমাধান ॥

৩৯ পত্রের শেষ—

হাস্যমুখে বলে ভীষ্ম শয্যা মোর শরে ।
এই উপাধান দেহ অসম্ভব্য মোরে ॥
আপনে ক্ষত্রিয় শূর বুঝহ সময় ।
শ্রেষ্ঠতা না পায় ইহা মোহর হৃদয় ॥
আরে পুত্র সব্যসাচি দেহ উপাধান ।
আমার মস্তক জেন নহে লম্ববান ॥
এত কথা শুনি পিতামহের উত্তর ।
গাণ্ডীবে যুড়িল [শর] সঙরি গদাধর ॥
তিন বাণ মারিয়া রাখিল সম করি ।
আশীর্ব্বাদ কৈল ভীষ্ম কুরু অধিকারী ॥

৬৬৬। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৪৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। বহু লিপিকরের হস্তাক্ষর। চতুর্থ ও পঞ্চম পত্রের মধ্যে হস্তাক্ষর, কাগজ ও বিষয়গত মিল না থাকায় বিভিন্ন পুথির পত্র বলিয়া মনে হয়। পরিমাণ ১৪॥০ × ৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৭ সাল।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মহামুনি ।
শুনিতে জন্ময়ে জ্ঞান ভারথ কাহিনী ॥
তোমার পদ্মের মুখ অমৃত সমান ।
তাহে কত মধু স্রবে নাহিক সংখ্যান ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার ।
কহ২ মহামুনি করিয়া বিস্তার ॥
মুনি বলে শুনহ পাণ্ডবচূড়ামণি ।
তব পিতামহকথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
অবধান কর পরীক্ষিতের তনয় ।
সমরে পড়িলা যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ অহ যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ ।
আপন ইৎসায় তেহোঁ হইলা নিধন ॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন ।
ভীষ্মের পতনে কর্ণ শোকাকুল মন ॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শেষ—

ধৃষ্টদ্যুম্নহাথে শুনি পিতার মরণ ।
মহাক্রোধে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন ॥
দুর্য্যোধন চাহি বলে দ্রোণের কুমার ।
আমি জে কহিয়ে তাহা শুন নৃপবর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া যদি এড়ি চাপ ।
বহু ধর্ম্ম হয় নষ্ট হয় গুরু পাপ ॥
এত শুনি আনন্দিত কুরুর কুঙর ।
যদ্ধ করিবারে গেল স্থান আপনার ॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ আপার ।
সব কুরু আজি আর হইব সংহার ॥
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় স্থানে ।
দ্রোণপর্ব্ব সাঙ্গ হইল নিবেদনে ॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। তারিখ ১২ ফাল্গুন সন ১১৮৭ সাল।

৬৬৭। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৪৮, ৫০-৫৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। বহু পত্রের লেখা অস্পষ্ট। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০১ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীগণেশায় নম॥

পাণ্ডববিজয় দ্রোণপর্ব্ব লিক্ষতে।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মৈল সেনাগণ।
কর্ণ ঠাঞি কহিতে লাগিলা দুর্য্যোধন॥
হাহাকার করি সভে করয়ে রোদন।
অতিশোকে রোদন করএ সেনাগণ॥
কর্ণ ঠাঞি দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল।
ভীষ্মের কারণে কর্ণ শোকাকুল হইল॥
হৃদয়ে কম্পিত হয়্যা বসিয়া ভূমিত।
আপনা পাসরে বীর হইয়া বিস্মিত॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

শেষ—

ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের জীবন যদি এড়ি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে পড়ি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিঞা যদি জাই ঘর।
প্রতিজ্ঞা করিল আমি তোমার গোচর॥
গোবধ ব্রহ্মবধে জত পাপ হয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিঞা ·· আলয়॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার।
যুদ্ধ নিবারিঞা গেলা স্থান আপনার॥
সভে বলে কুরু আজি হইল সংহার।
পাণ্ডবের দলে হইল জয়২ আপার॥
বাদ্যের জতেক শব্দ না জাএ লিখন।
আনন্দে নৃত্য করে নট নটীগণ॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ হস্তি টলতি পাদেন [ইত্যাদি]। সন ১২০১ সাল তারিখ ২৯ আসাড়॥

৬৬৮। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—নন্দরাম দাস। পত্র ১-৬৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৪ সাল। আরম্ভ —

৺শ্রীশ্রীহরিঃ॥

অথ দ্রোণপর্ব্ব লিক্ষতে।
জন্মেজয় বলে মুনি অপূর্ব্ব কহিলে।
এমত রহস্য নাঞি শুনি কোন কালে॥
পিতামহগণ কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
তব রসে সুধারস ভাসিলাম আমি॥
ভীষ্মদেব শরশয্যায় রহিলা শুতিয়া।
কোন বীর যুদ্ধ তবে করিলা আসিয়া॥
সেই কথা তুমি মোরে কহ মুনিবর।
তব ভাষে স্নিগ্ধ মোর হয় কলেবর॥

ভণিতা—

কাশীদাস মহাশয় তেহো জ্যেষ্ঠতাত।
মৃত্যুকালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়া হাত॥
আয়ু অবশেষ বাপু জাই পরলোকে।
রচিতে না পাইল আমি বড় রইল শোকে॥
আশীর্ব্বাদ করি আমি বলিএ তোমারে।
পাণ্ডবচরিত্র বাপু রচিবে সাদরে॥
তার আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি রাধাশ্যাম।
দ্রোণপর্ব্ব ভারথ রচিলা নন্দরাম॥

শেষ—

ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘর।
করিল প্রতিজ্ঞা আমি সভার ভিতর॥

গোবধে ব্রহ্মবধে জত হয় পাপ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে না মারিয়া যদি এড়ি চাপ ॥
এত শুনি আনন্দিত অন্ধের কুমার।
যুদ্ধ নিবৰ্ত্তিয়া গেলা আপনার ঘর ॥
পাণ্ডবের দলে হইল আনন্দ আপার।
সভে বলে কুরু আজি হইল সংহার ॥
আনন্দিত হয়্যা নৃত্য করে নটীগণ।
বাদ্য জত হইল তাহা না জায় লিখন ॥
রত্নসিংহাসনে বৈসে ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃগণ সহিত রাজা আনন্দিত মন ॥
বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে।
দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এই ক্ষেণে ॥

ইতি শ্রীমহাভারথে দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। মৌজে বেল্যাতোড় গ্রামের লিখিতং শ্রীমদুষুদন শর্ম্মা ও শ্রীগুরুচরণ নিওগী ও কাশীনাথ নিওগী ও শ্রীরাইচরণ নিওগী মোজে ঐ গ্রামের শ্রীগোপাল গরাঞীয়ের পুস্তক ॥ জাউঘরে পরচালিতে উত্তর মোখে বসিয়া বেলা এক প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল বার সমবার ॥ সন ১২২৪ সাল তারিখ ২৫ আসাড়।

৬৬৯। মহাভারত—দোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪২ সাল। পুথিতে কশীরাম দাসের ভণিতাই অধিক। কিন্তু শেষ দিকে নন্দরাম দাসেরও ৫ পাঁচটি ভণিতা আছে। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সরণং ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল জদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তেহো হইল পতন ॥
ভীষ্ম জদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার করি সভে করয়ে রোদন ॥
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিলা দুর্য্যোধন ॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥
নন্দরাম দাস কহে সেবি রাধাপতি।
তুমা বিনে গোবিন্দ নাহিক মোর গতি ॥

শেষ—

ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘর।
করিল প্রতিজ্ঞা আমি সভার ভিতর ॥
গোবধে ব্রাহ্মণবধে জত পাপ হয়।
এই পাপের পাপী হই কহিল নিশ্চয় ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন আনন্দিত মন।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল আপন ভুবন ॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ আপার।
সভে বলে কুরু আজি হইল সংহার ॥
বাদ্য কোলাহল হৈল না জায় লিখন।
আনন্দেতে নৃত্য করে জত নৃত্যগণ ॥
রত্নসিংহাসনে বৈসে ধর্ম্মের নন্দন।
ভাই বন্ধু আনন্দিত জত সভাজন ॥
বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হৈল সমাধানে ॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ সক ১৽৫৭ সাল সন ১২৪২ সাল লিখিতং শ্রীহলধর দেবসর্ম্মা বি তেরিখ ২····· বিহসপতিবার।

৬৭০। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক

পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬০ সাল।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণং
দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতেঃ

মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারে সেনাগণ।
আপন ইৎসায় ভীষ্ম হইলা পতন॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার করি সভে করএ রোদন॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

শেষ—

এত শুনি আনন্দ কৌরব অধিকারী।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থান আপনারি॥
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার॥
বাদ্যের যতেক শব্দ না জায় গণন।
আনন্দিত নৃত্য করে নট নটীগণ॥
সিংহাসনে বসিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দিত মন॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মন রহে নিরন্তর।
দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত হইল সত্বর॥

ইতি মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ পাটক শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষ লিখিত শ্রীমাধবচন্দ ঘোষ সাং খোসালপুর বারসএ ৬০ সাল তারিখ ১৪ চোইত॥ কালিঠাকুরানির চালায় বসে ঔত্তর মুখ খুটি টেস দিয়া সাঙ্গ করিলাম॥

৬৭১। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥
অথ দ্রোণপর্ব্ব লিক্ষতে॥
পয়ার॥

মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িলা যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় ভীষ্ম হইল পতন॥ ইত্যাদি

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব উপাখ্যান জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

৩৯ পত্রের শেষ—

তবে পার্থ মহাবীর পুরিয়া সন্ধান।
একবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রণেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
ভঙ্গ দিয়া গেল রণে কর্ণ যোদ্ধাপতি॥

৬৭২। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৫, ১৭-৩৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২।০ × ৪।০ ইঞ্চি। শেষ অংশও খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীরাম॥
দ্রোণপর্ব্ব লিক্ষ্যতে॥

মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল জদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারিল সেনাগণ।
আপন ইৎসায়ে তেহো হইলা পতন॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচন॥

শেষ—

হেন কালে পিণ্ডি রাজা রথে চড়ি আইল।
দুর্য্যোধন রাজা প্রতি ডাকিয়া বলিল॥
কি কারণে মহারাজা চিন্তা কর তুমি।
দেখ ঘটোৎকচে আজি বিনাশিব আমি॥

লিপিকর লেখনীকে এইখানেই বিশ্রাম দিয়াছেন।

৬৭৩। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১১, ২১-২৫, ২৭-৩১, ৩৩-৪২, ৪৪-৪৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। কোন্ সালে লেখা, তাহার উল্লেখ নাই। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীদুর্গা॥

অথ দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাজন॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারে সেনাগণ।
আপন ইৎসায় তেহো হইলা পতন॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা ভগদত্ত বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

শেষ—

রত্নসিংহাসনে বইসে ধর্ম্মের কুমার।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাজা আনন্দ আপার॥
বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হইল সমাধানে॥

ইতি দ্রোনপর্ব্ব সমাপ্ত। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি] তারিখ ২৮ বৈইসাখ লিখিতং শ্রীভুবনচন্দ্র ...সাঃ দেহুড়।

৬৭৪। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-৩৮, ৪০-৪৫, ৪৭, ৪৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

একা পাণ্ডুপুত্রগণে ধরি দিব আমি॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন।
শীঘ্র উঠি কর্ণ সনে কৈল আলিঙ্গন॥
হেন কালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি।
দুর্য্যোধনে ডাকিয়া বলিল [শীঘ্রগতি]॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমানে।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমানে॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্বে সুধারস দ্বিতীয় সমরে।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নরে॥

৪৯ পত্রের শেষ—

দুই জনে বাণ এড়ে পুরিয়া সন্ধান।
দোহাকার বাণে বাণ করে খান২॥
উত্তরের সহ জোঝে কর্ণের নন্দন।
কর্ণসুত বৃষকেতু করে মহারণ॥

৬৭৫। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৫৬-৬৮, ৭১-৭২, ৭৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকালাদি নাই। ৫৬ পত্রের আরম্ভ—

দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর॥

অশ্ব রথ সারথি সব হৈল চুর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা ঘটোৎকচ ক্ষয়।
গোবিন্দচরণে গতি কাশীদাস কয়॥

শেষ—

রত্নসিংহাসনে বৈসে ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃসহ মহারাজা আনন্দিত মন॥
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হইল সমাপনে॥

৬৭৬। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৪২-৫৫, ৭৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৬৹ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

৬৭৫ সংখ্যক পুথির বিবরণে যে দ্রোণ-পর্ব্বের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আলোচ্য পুথিখানি তাহারই প্রথম অংশ। সুতরাং পৃথক্ উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

৬৭৭। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-১৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রথম কয়েক পত্রের কিছু কিছু অংশ নষ্ট হইয়াছে। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২৬৹ × ৪৬৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

······দ্রোণ বীর পৃথিবী ভিতরে।
অর্দ্ধরথী করি বোলে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
কর্ণ বোলে রাজা তুমি কর সেনাপতি।
··· হইল হৃষ্ট কৌরব প্রভৃতি॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

সপ্তদশ পত্রের শেষ—

হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুই জনে।
তবে শেলি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে
দেখিয়া হইল হাস্য ভারথ মণ্ডল।
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান॥

৬৭৮। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১১-১৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩ × ৬ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৫ সাল। একাদশ পত্রের আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীরাম॥

শঙ্খনাদ শব্দ কৈলা বীর ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে দেখিয়া অশ্বত্থামা মহাশয়॥
দিব্য অস্ত্র মহাবীর করিল সন্ধান।
দেবাসুরযুদ্ধ ইথে না হয় সমান॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে কর্ণপর্ব্বে বধ দুঃশাসন॥

শেষ—

আজি জেন বসুমতী পাইলেন দিব্যগতি
সফল হইল পরিশ্রম।
কর্ণ বীর মহাবল পড়িলেন ধরণীতল
সমরে সাক্ষাত জেন যম॥
হেন মত আপ্তশোকে পাসরিল সর্ব্বলোকে
নাচি গাহি শিবিরে আইলা।
আনন্দ পাণ্ডব দলে ফিরে বাদ্য কোলাহলে
জার জেই গৃহে প্রবেশিলা॥

ইতি কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত তারিখ ৩ পৌষ রোজ

মঙ্গলবার লিখিতং শ্রীরামস্বরন সিং মজুমদার সাঃ বালিয়া পরগনে ফতেসিং মৎসখালি... সন ১১৮৫ সাল।

৬৭৯। **মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০২ সাল। বন্দনাদির পর আরম্ভ—

ভীষ্ম দ্রোণ পড়িল চিন্তিত দুর্য্যোধন।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে রণ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা আকুল পরাণ।
মন্ত্রিগণ আনি তবে করিছে বিধান॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃতলহরি।
কাশী কহে কর্ণপর্ব্ব শুন কর্ণ ভরি॥

শেষ—

আজি জেন বসুমতী পাইলেন দিব্যগতি
সফল হইল পরিশ্রম।
কর্ণ বীর মহাবল পড়িল ধরণীতল
সমরে সাক্ষাত জেন যম॥

ইতি শ্রীমহাভারথে কর্ণপর্ব্বে কর্ণ বির নিপাতিত॥...লিখিত শ্রীরাজিবলোচন সাঃ বালিয়া...সন ১২০২ সাল।

৬৮০। **মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩২, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩॥০×৪৸০ ইঞ্চি লিপিকাল ১২৩৬ সাল।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নম॥
অথ কর্ণ্ন লিক্ষতে॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করিল কৌরব পামর॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর।
সমরে পড়িল ভরদ্বাজ কোঙর॥
সেনাপতি পড়িল পালায় কুরু[গণ]।
দেখিয়া পাইল ভয় রাজা দুর্য্যোধন॥
রাজাকে কাতর দেখি বলে বীরগণ।
অবধানে শুন রাজা কুরুর নন্দন॥
সর্ব্বগুণে আছে বীর কর্ণ মহামতি।
সেনাপতি অভিষেক কর শীঘ্রগতি॥

শেষ—

ওথা রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ্নের মরণে।
উঠি বসি রজনী পোহায় জাগরণে॥
প্রভাতে উঠিয়া দুর্য্যোধন নরপতি।
কৃপ অশ্বত্থামারে আনিলা শীঘ্রগতি॥
শৈল্য রাজা প্রভৃতি আইল সর্ব্বজন।
কাতর হইয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন॥
... ...
সত্যবতীহৃদয়নন্দন মুনি ব্যাস।
জার মুখচন্দ্রে মহাভারথ প্রকাশ॥
জাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় মন।
কাশীরাম দাস কহে কর্ণের নিধন॥

ইতি কর্ণ্নপর্ব্ব লিক্ষতে সন ১২৩৬ সাল তারিখ ৮ জ্যৈষ্ঠ।

৬৮১। **মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি এবং শেষ দুই পৃষ্ঠায় ১০ ও ১৩

পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৫ সাল। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি ॥

অথ কর্ন্নপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা কহ মুনিবর।
পিতামহগণ কথা অতি মনোহর ॥
দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে যদি হইল নিধন।
তবে কোন কর্ম্ম কৈল রাজা দুর্য্যোধন ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন কুরুবর।
সমরে পড়িল বদি দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
... ...
সর্ব্বগুণে কর্ণ বীর আছে মহামতি।
সেনাপতি অভিষেক কৈল শীঘ্রগতি ॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃত সমানে।
কাশী কহে কর্ণপর্ব্বে বধ দুঃশাসনে ॥

শেষ—

মুনি বলে নৃপবরে শৈল্য সর্ব্ব সভা···
দুর্য্যোধন নাহি ছাড়ে আশ।
পড়ে বীর ভীষ্ম দ্রোণে কর্ণের মরণ শুনে
শৈল্য বীর পাণ্ডব বিনাশ ॥

ইতি কর্ণপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত॥ সন ১২৪৫ সন বার সত্য পঙতালিস সাল তারিখ ৬ বৈসাখ লিখীতং শ্রীরামমোহন সরকার সাং কুসমা পরগনে জানাবাজ পটনার্থে শ্রীগয়ারাম মাইতি সাং কীশোরচক পরগনে···।

৬৮২। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৪২, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। প্রথম দিকের বহু পত্রের দক্ষিণাংশ ছিন্ন। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

৺৭শ্রীদুর্গা সহায় ॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করিলা কৌরব বর্ব্বর ॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর।
সমরে পড়িল ভরদ্বাজের কোঙর ॥
সেনাপতি পড়িল পালায় কুরুগণ।
দেখিয়া ফাফর হইল রাজা দুর্য্যোধন ॥
রাজারে কারত দেখি বলে বীরগণ।
অবধানে শুন রাজা কুরুর নন্দন ॥
সব গুণে আছে বীর কর্ণ মহামতি।
সেনাপতি অভিষেক কর শীঘ্রগতি ॥

শেষ—

হোথা রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের কারণে।
উঠি বসি রজনী পোহায় সর্ব্বজনে ॥
প্রভাতে উঠিয়া দুর্য্যোধন মহামতি।
কৃপ অশ্বত্থামারে আনিল শীঘ্রগতি ॥
আইল ত শৈল্য রাজা আর যত জন।
কাতর হইয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এত দূরে কর্ণপর্ব্ব হইল সমাপন ॥

৬৮৩। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৫।০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

অথ কর্ণপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি।
জেইরূপে হত দুষ্ট কর্ণ সেনাপতি ॥
প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাক হেতু বিধাতা সংহারে ॥
দ্রোণ যদি পড়িল চিন্তিত দুর্য্যোধন।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে রণ ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা আকুল পরাণ।
মন্ত্রিগণে ডাকি তবে করয়ে বিধান ॥
দুর্য্যোধন বলে সভে শুনহ বচন।
মহাযুদ্ধে হৈল দেখ দ্রোণের নিধন ॥
কারে সেনাপতি তবে সৈন্যেতে করিব।
পাণ্ডবে জিনিয়া তবে জয় উদ্ধারিব ॥
মন্ত্রিগণ বলে শুন কহিয়ে তোমারে।
সেনাপতি কর আজি কর্ণ মহাবীরে ॥

শেষ—

এথা দুর্য্যোধন শুনি কর্ণের নিধন।
উঠিয়া বসিয়া রাত্রি করে জাগরণ ॥
প্রভাতে উঠিয়া দুর্য্যোধন নরপতি।
কৃপ অশ্বথামারে ডাকিল শীঘ্রগতি ॥
শল্য রাজা প্রভৃতি আইল সর্ব্বজন।
কাতর হইয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন ॥
ইহার উপায় মোরে কহ সর্ব্বজন।
কর্ণ বীর হত হইল হইবে কেমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে কর্ণপর্ব্ব সমাধান ॥

৬৮৪। **মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৷৶০ × ৪৷৶০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ নম গণেশায় নম ॥
কর্ণপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
তদন্তরে কি করিল কৌরব বর্ব্বর ॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কর্ণপর্ব্ব কাশী কহে শুন কর্ণ ভরি ॥

শেষ—

অর্জ্জুন বরিষে বাণ পরশে আকাশ।
অন্ধকার হৈল দিন না করে প্রকাশ ॥

৬৮৫। **মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১২, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥
অথ সৈলপর্ব্ব লিখতে ॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনির সদনে।
তদন্তরে কি করিল রাজা দুর্য্যোধনে ॥
কর্ণ হেন মহারথি রণে হইল হত।
তথাপিহ আশা না ছাড়িল ধৈর্য্যহত ॥
কিরূপে পাণ্ডব সহ পুন কৈল রণ।
সেনাপতি অপর হইল কোন জন ॥

শেষ—

শল্যপর্ব্ব দিব্য কথা ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে প্রবল সুখ মনের পিরিত ॥

সকল আপদ খণ্ডে ভারত শ্রবণে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে ॥
ইতি সৈলপর্ব্ব সমাপ্ত ১২ বারর পত্রে হইল লিখিতং শ্রীরামকমল চক্রবত্তি সাঃ পাজাঞা সন ১২৪০ সালের ২৪ শ্রাবন বুধবার সমাপ্ত হইল এই পুস্তক জে চুরি করিবে সে সাখুরে হইবেক ॥

৬৮৬। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। শেষে লিপিকাল প্রভৃতি নাই। কিন্তু ১৫শ পত্রের কোণে ১২২০ সাল লেখা আছে। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥
অথ সৈলপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ তপোধন।
অল্প সৈন্যে কি করিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
সকল বিনাশ হইল শুন মহাশয়।
কোন কর্ম্ম কৈল তবে কুরুর তনয় ॥
সে কথা আমারে তুমি কহ মুনিবর।
বড়ই রহস্য কথা শুনিব সাদর ॥

শেষ—

পৃথিবীর নাথ চক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন।
ডরে পালাইয়া তবে করিল গমন ॥
গদা কোটা করি রাজা চলিল সত্বরে।
নিকটে দেখি দ্বৈপায়ন হ্রদ পরিসরে ॥
প্রবেশ করিল রাজা জলের ভিতর।
সিংহভয়ে জলে যেন প্রবেশে কুঞ্জর ॥
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণব্যান ॥
ইতি সৈলপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্ট [ইত্যাদি]

৬৮৭। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ ও শেষ পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৫×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং ॥
অথ সৈল্যপর্ব্ব লিখ্যতে ॥
কর্ণপর্ব্ব কথা শুনি রাজা জন্মেজয়।
পুন মুনিবরে কহে করিয়া বিনয় ॥
তবে কোন কর্ম্ম কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
কাহারে বাহিনীপতি করিল রাজন ॥

শেষ—

সঞ্জয় বলয়ে তবে শুন কুরুপতি।
অধর্ম্মের ফলে হৈল এমত দুর্গতি ॥
সভামধ্যে বসি জেই অন্যায় করিল।
হৃদয়ে ভাবিয়া দেখ এখন ফলিল ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত লহরি।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥

ইতি সৈল্যপর্ব্ব সমাপ্ত ॥

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীসুশীলকুমার দে

আপনারা আমাকে পুনর্ব্বার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করে যে সম্মান দিয়েছেন, তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের ভাষা ও সাহিত্য-চর্চ্চার প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান; তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া যে কত গৌরবের ও সেই সঙ্গে কত দায়িত্বের কথা তা আমি জানি। জানি বলেই, আপনাদের আহ্বান স্বীকার করলেও, নিজের অক্ষমতা অনুভব করে নিতান্ত কুণ্ঠিত বোধ করছি। আমার অবসর অল্প; গত এক বৎসরের মধ্যে প্রায় আট মাস কাল সরকারী কাজে আমাকে কলকাতার বাইরে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। আপনাদের সকল অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারিনি, এবং পরিষদের কাজেও সমগ্র মন দিতে পারিনি; সেজন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে উপস্থিত থেকে আপনাদের সহযোগিতায় গুরু দায়িত্বের ভার বহন করতে পারব।

আমি মনে করি, এই পরিষদের প্রতি সকল শিক্ষিত বাঙালীর একটা কর্ত্তব্য আছে। যদিও সভা-সমিতি ব্যাপারে আমি তেমন অভ্যস্ত নই, তবুও এই আন্তরিক কর্ত্তব্যবোধের জন্য আপনাদের নির্ব্বাচন শিরোধার্য্য করতে হয়েছে। পরিষদের সহিত আমার সংযোগ বহুদিনের, সাল ১৩২৭-২৫ (ইং ১৯১৮-১৯) সন থেকে। এর মধ্যে প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর আমি ছিলাম বিদেশে ও মফঃস্বলে। সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার আপনাদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলাম; কিন্তু সে পদাধিকার স্থায়ী হয়নি। সুতরাং পরিষদের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার এখনও ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হয়নি। তবুও যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়, সকল বাধাবিপত্তিসত্ত্বেও পরিষদের অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হয়নি, এবং এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু আশা করবার আছে।

কিন্তু এই ভবিষ্যতের দায়িত্ব কেবল আপনার বা আমার নয়, সকল শিক্ষিত বাঙালীর। এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, বর্ত্তমান কালে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন না হলেও যথোচিত উৎসাহ পোষণ করেন না। এর কারণ কি তা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষদের ভাববার বিষয়; এবং কি উপায়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

কতকগুলি উপায় পরিষদ্ ইতিমধ্যেই অবলম্বন করেছে। সাহিত্য-পরিষদের নাম শুনলে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মনেও প্রাচীন পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা, জীর্ণ কীটদষ্ট পুস্তক, অদ্ভুত বানান ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর প্রকাশ ইত্যাদি গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের বিভীষিকা জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই বিভীষিকা দূর করবার জন্য, পরিষদের আপাততঃ প্রাচীন সাহিত্য পরিত্যাগ করে আধুনিক সাহিত্যের গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করেছে। কয়েক

বৎসরের মধ্যে ভারতচন্দ্র, রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি গত শতাব্দীর সাহিত্যধুরন্ধরদের রচনাবলীর বিশুদ্ধ সংস্করণ সযত্নে মুদ্রিত হয়েছে। এ যে কত বড় কাজ তা সাহিত্যানুরাগীমাত্রেই জানেন। বাজারে প্রচলিত গ্রন্থাবলীগুলিতে যেরূপ ভ্রমাত্মক পাঠ, এমন কি শব্দ ও পংক্তির অনবধান বর্জ্জন দেখা যায়, তাতে গ্রন্থকারদের জীবিতকালের প্রামাণিক সংস্করণ অনুসরণ করে এরূপ বিশুদ্ধ সংস্করণের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এগুলি জনপ্রিয় হয়েছে কারণ, এতে পাণ্ডিত্যের সার আছে, খোসার আড়ম্বর বা বিড়ম্বনা নেই।

এই প্রসঙ্গে পরিষদের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলতে হয়, যার দ্বারা কেবল পণ্ডিত ব্যক্তির নয়, সাধারণ পাঠকেরও উপকার হয়েছে। গত শতাব্দীর যে সকল ছোট-বড় স্মরণীয় লেখক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত প্রামাণিক ও তথ্যবহুল জীবনী ও রচনার পরিচয় প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড পুস্তিকায় ন্যূনাধিক ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। এই সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় এ পর্য্যন্ত ৯৬টি পুস্তিকা আট ভাগে প্রকাশিত হয়েছে। স্বল্প মূল্যে ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখকদের জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে অনেক সঠিক খবর দেওয়া হয়েছে, যা অন্যত্র একসঙ্গে পাওয়া যাবে না।

এই কাজগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই ; কিন্তু এ কথা বলা দরকার যে, প্রাচীন সাহিত্যকে একেবারে বাদ দিলে পরিষদের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বেশি কথা বললার দরকার নেই, এ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বাংলা ভাষার উপযুক্ত অভিধান এ পর্য্যন্ত সংকলিত হয়নি। অবশ্য এরূপ কাজ ব্যয়, পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ ; তথাপি পরিষদের এ ভার গ্রহণ করতে হবে।

জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে, কিছুকাল পূর্ব্বে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের আনুকূল্যে ইতিহাস সম্বন্ধে যে বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়, তা একেবারে নিরর্থক হয়নি। এইরূপ আয়োজন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও করা উচিত। বিশেষতঃ গুজরাতী মারাঠী, তামিল তেলুগু, ওড়িয়া ও অসমীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে এবং এই সকল বিষয়ে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও এই সকল উপায়ে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্য কর্ত্তব্য বলেই মনে হয়।

আর একটি কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের নাকি পরিষদে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয় না। এইরূপ অভিযোগ প্রায় শোনা যায়। তা হয়ত সত্য নয়, কিন্তু এরূপ মনোভাব দূর করতে হলে, যাঁরা যথার্থ গবেষক তাঁদের গ্রন্থাগারে বা পুঁথিশালায় পাঠের যথোচিত সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করি, তখন মনে হয়েছিল,

পরিষদের অতিপ্রাচীন নিয়মাবলীর সংশোধন আবশ্যক। যখন এই নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়েছিল তখন পরিষদের শৈশবাবস্থা; সুতরাং আপনারা বুঝতে পারবেন যে পরিষদের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় এতে এমন অনেক কিছু আছে যার আর থাকা উচিত নয়, এবং এমন অনেক কিছু নেই যার থাকা উচিত। সুখের বিষয়, ইতিমধ্যে একটি নিয়মাবলী সংশোধন সমিতি গঠন করে পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। আশা করি, এই সমিতির কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

সালতামামি দেওয়া আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের উদ্দেশ্য নয়। সম্পাদকের বিবরণী থেকে পরিষদের কাজকর্ম্ম ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন। আমাদের সভ্যসংখ্যার হ্রাস হয়নি, কিন্তু তেমন বৃদ্ধিও হয়নি। অবশ্য পরিষদের মত বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠানকে আমরা ক্লাব বা Circulating Library করে তুলতে পারিনা; সুতরাং সভ্যসংখ্যা সীমাবদ্ধই থাকবে। সেইজন্য, সরকারের সদয় আনুকূল্য ছাড়া সাধারণের উদার সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমাদের বিশেষ করে প্রার্থনীয় এবং এর ওপরেই পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করবে। আমাদের যে কটি Prize Fund প্রভৃতি গচ্ছিত তহবিল আছে, তার বার্ষিক আয় যৎসামান্য। দাতাগণের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ কিন্তু দানের পরিমাণ তদনুরূপ না হওয়াতে তার দ্বারা কোনও বড় কাজ করা যায় না।

আপাততঃ আমাদের আয় নিতান্ত নির্দ্ধারিত। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য আমাদের নিরাশ হলে চলবে না। প্রায় সমস্ত বড় প্রতিষ্ঠানেই অল্পবিস্তর অর্থকৃচ্ছ্রতা আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, অতি সামান্য আরম্ভ থেকে আজ সাহিত্য-পরিষদ্ এত বড় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থের অভাব চিরকালই ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধা ও উৎসাহের অভাব ছিল না। গত শতাব্দী থেকে যাঁদের নাম পরিষদের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত, তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বনামখ্যাত, ভাষা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক একজন চিরস্মরণীয় দিক্‌পাল। স্বল্প পুঁজি সত্ত্বেও তাঁদেরই আন্তরিক চেষ্টা ও অনুরাগে পরিষদ্ বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সেই প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে বা বর্দ্ধিত করতে হলে আমাদেরও অনুরাগ, উৎসাহ ও আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন, যাতে আমরা বাঙালী শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারি। ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু পরিষদের মত প্রতিষ্ঠান আপনার আমার, সকলেরই। আপনি আমি যতদিন আছি ততদিন হয়ত আত্মপ্রসাদে মনে করতে পারি যে সবই বেশ চলছে। কিন্তু আপনি আমি ত চিরকাল দখল করে থাকব না, থাকাও উচিত নয়। তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ত্রুটিবিচ্যুতির যা ছিদ্র আছে বা থাকা সম্ভব, তা যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা না করলে পরিষদের উন্নতি বাধাগ্রস্থ হতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ ভাবে সাবধান হতে হবে।

এইটুকু আপনাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন।

ত্রিষষ্টিতম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশন ২৯শে শ্রাবণ ১৩৬৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, সেইদিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী ও সদস্য পরলোক গমন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি :—

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ :—অন্নপূর্ণা গোস্বামী, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, বনমালী বেদান্ততীর্থ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্ম্মল বসু, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী।

পরলোকগত অধ্যাপক সদস্য :—অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

পরলোকগত সাধারণ সদস্য :—অমরনাথ দাস, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, জিতেন্দ্রমোহন সেন, মনিমোহন শীল ও শিশিরকুমার নিয়োগী।

অমরনাথ দাস মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। এক সময়ে তিনি পরিষদের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবেই যুক্ত ছিলেন।

বিগত ২৩।১২।৬৩ তারিখে পরিষদের পুথিশালাধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকরূপে তিনি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাব পূরণ হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য।

আনন্দ-সংবাদ

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস যথাক্রমে দিল্লীর "আকাদমী পুরস্কার" ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সরোজিনী পদক" পাইয়াছেন। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পূর্ব্বতন সদস্য শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পূর্ব্বতন সহকারী সভাপতি ড° শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র-পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীদীপক দত্তচৌধুরী তাঁহার মাতা সরলা দেবীর রচিত 'শতগান' ব্যতীত অন্য সমুদায় গ্রন্থাবলীর স্বত্ব পরিষদ্‌কে দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণ।

বান্ধব : একজন : রাজা ও শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট সদস্য : দুইজন—ড° শ্রীযদুনাথ সরকার ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য : একত্রিশজন :—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২। ড° শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৩। ড° শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৪। ড° শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৫। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৬। শ্রীসতীশচন্দ্র

বসু, ৭। শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৯। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১০। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১১। ড° শ্রীরঘুবীর সিং, ১২। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৩। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৪। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৫। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ১৬। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৭। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ১৮। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ২০। শ্রীত্রিদিবেশ বসু, ২১। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২২। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, ২৩। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২৪। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, ২৬। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৮। শ্রীবিভূভূষণ চৌধুরী, ২৯। শ্রীঅজিত বসু, ৩০। শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী ও ৩১। আর্থার হিউজ।

অধ্যাপক সদস্য ঃ বর্ষশেষে ৮ জন।

সহায়ক সদস্য ঃ বর্ষশেষে ৬ জন।

সাধারণ সদস্য ঃ কলিকাতাবাসী ৮৯৯ জন ও মফঃস্বলবাসী ৫৩ জন; মোট ৯৫২ জন।

আলোচ্য বর্ষে ৫ জন মফঃস্বলবাসী সহ মোট ১৯৮ জন সাধারণ সদস্য-পদ ও একজন আজীবন-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সাধারণ সদস্যের মধ্যে ৫ জন পরলোকগত হইয়াছেন, ৫১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল চাঁদা বাকী পড়ায়, নিয়মানুযায়ী ১৫৪ জনের নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৫১ জন সদস্যের পদত্যাগের কারণ—বাসস্থান পরিবর্ত্তন, (৮), সময়াভাব (৯), পুস্তক আদান-প্রদানে অসুবিধা (৩৪)।

ত্রিষষ্টিতম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ :

সভাপতি : ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে; সহকারী সভাপতিগণ : শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ড° শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদক : শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, সহকারী সম্পাদকগণ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রশালাধ্যক্ষ, শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী; গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত; পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; পুথিশালাধ্যক্ষ : (২৩ চৈত্র ১৩৬৩ পর্য্যন্ত) দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ : (সদস্যগণ পক্ষে) শ্রীঅমল হোম, রেভাঃ এ. দোঁতেন, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীসুশীল রায়। (শাখাপরিষৎ পক্ষে) শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীমানিকলাল সিংহ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। (পৌরসভার প্রতিনিধি) শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে, ১৯৫৭-এ) ডাঃ কানাইলাল দাস।

পরিষদের কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত এই বৎসরেও সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, চিত্র-নির্ব্বাচন, গ্রন্থপ্রকাশ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

২। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতি কর্ত্তৃক পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধনের প্রাথমিক কার্য্য শেষ হইয়াছে।

৩। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রায় অনুসারে পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:

বিদ্যাসাগর বক্তৃতা সমিতি: শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক ও পুরস্কার সমিতি: শ্রীসজনীকান্ত দাস, সরোজিনী পদক-সমিতি: শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা সমিতি: শ্রীনরেন্দ্র দেব, কমলা বক্তৃতা সমিতি: ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে।

(খ) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়:

নরসিংহ দাস পুরস্কার সমিতি: শ্রীসজনীকান্ত দাস।

(গ) UNESCO-র সহিত সহযোগিতাকল্পে ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল কমিশনের উপসমিতিতে: শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

(ঘ) রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গঠিত উপসমিতি: ড° শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

(ঙ) দিল্লীর সাহিত্য আকাদমী একজন বাঙালী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে তিনজন উপযুক্ত সাহিত্যিকের নাম পাঠাইতে অনুরোধ করায় নিম্নলিখিত তিন জনের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে:—শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য।

(৪) পরিষদের সংগৃহীত পুস্তক, প্রত্নসামগ্রী এবং পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী নিম্নলিখিত প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল:

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী।

(খ) সাহিত্য আকাদমীর উদ্যোগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পুস্তক প্রদর্শনী।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমিতির কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রদর্শনী।

পদক পুরস্কারাদি প্রদান ও সম্বর্দ্ধনাদি জ্ঞাপন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার "মধুসূদন গুপ্ত" বিষয়ক রচনার জন্য এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'খাদ্যকথা' গ্রন্থ ও খাদ্যতত্ত্ব বিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য যথাক্রমে পরিষৎ-প্রদত্ত "রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার" ও "জগদীশচন্দ্র বসু পুরস্কার" পাইয়াছেন।

নেপাল ও ইন্দোচীন হইতে আগত সাহিত্যিকগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশন

১। ৬২তম বার্ষিক অধিবেশন; ২৯ শ্রাবণ ১৩৬৩, ২। প্রথম মাসিক অধিবেশন, ২৪ কার্ত্তিক ১৩৬৩। ৩। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩, ৪। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৮ পৌষ ১৩৬৩ ৫। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ১৯ মাঘ ১৩৬৩, ৬। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন ২৫ ফাল্গুন ১৩৬৩, ৭। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ২৩ চৈত্র ১৩৬৩, ৮। সপ্তম মাসিক আধবেশন ১১ বৈশাখ ১৩৬৪, ৯। অষ্টম মাসিক অধিবেশন ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, ১০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভা ও কবির সমাধিস্তম্ভে মাল্যাদি অর্পণ অনুষ্ঠান ১৪ আষাঢ় (২৯ জুন ১৯৫৭) ১৩৬৪, ১১। নবম মাসিক অধিবেশন ২১ আষাঢ়, ১৩৬৪।

গ্রন্থাগার

আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থাগারে মোট ২৭৯ খানি গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৬৭ খানি ক্রীত এবং ১৪২ খানি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত। এতদ্ব্যতীত 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে ৫ খানি দৈনিক, ১১ খানি সাপ্তাহিক এবং ৩৭ খানি অন্যান্য পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে। পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিনিময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের প্রকাশিত ১৩ খানি গ্রন্থ পরিষদকে দিয়াছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকখানি চীনা পুস্তক পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থাগার হইতে (বৃহস্পতিবার এবং অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ছাড়া) প্রত্যহ ১টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত পুস্তক আদান প্রদান করা হইয়াছে। বিগত বর্ষে মোট ২৬,৮৯০ জন পাঠক পাঠিকা (গড়ে প্রতিদিন ৯০ জন) গ্রন্থাগারের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থসংগ্রহের ৩২০০০ খণ্ড পর্য্যন্ত তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু স্থানাভাবে ২৬০০০ খণ্ড মাত্র সুবিন্যস্ত ভাবে রাখিতে পারা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইস্পাত নির্ম্মিত পুস্তকাধার নির্ম্মাণের জন্য ১৪০০০৲ (চৌদ্দ হাজার) এবং গ্রন্থতালিকা সঙ্কলনের জন্য ৪০০০৲ (চারি হাজার) টাকা পরিষদকে সম্প্রতি দান করিয়াছেন। আশাকরা যায় আগামী বর্ষেই পুস্তকাধার তৈয়ারী হইয়া যাইবে এবং গ্রন্থে তালিকা সঙ্কলনের কাজও কিছুটা অগ্রসর হইবে।

পুথিশালা

আলোচ্যবর্ষে বারখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার চারিখানি বাংলা পুথি এবং আটখানি সংস্কৃত পুথি। শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় ১৬৫৭ শকাব্দে লিখিত "বাশুলী মঙ্গল" নামক একখানি এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার দুইখানি পুথি (সারদাতিলক ও বীরভদ্র তন্ত্র) উপহার

দিয়াছেন। অবশিষ্ট নয়খানি পুথি সঞ্চিত পত্ররাশি হইতে বাছিয়া পাওয়া গিয়াছে। সেই পুথিগুলির নাম এই—১। চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড, ২। চৈতন্যমঙ্গল, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড, ৩। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড ৪। গ্রহকৃত শুভাশুভ বিচার, ৫। শ্রীমদ্ভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ৬। শ্যামারহস্য, ৭। সামুদ্রক ৮। সংকল্প ভাগবতামৃত, ৯। বৈষ্ণববন্দনমালা। এই বারখানি গ্রন্থ তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—বাংলা পুথি—৩৩২১; সংস্কৃত পুথি—২৪৭৬; তিব্বতী পুথি—২৪৪; ফার্সী পুথি—১৩; মোট—৬০৫৪।

আলোচ্যবর্ষে পরিষদের সংগ্রহভুক্ত বাংলা পুথির ৩৩০খানির (৬৭১—১০০০) বিবরণ-মূলক তালিকা (Descriptive Catalogue) সঙ্কলিত হইয়াছে। এই তালিকা ক্রমে ক্রমে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' মুদ্রিত হইতেছে। পরিষৎ-পত্রিকায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত সংখ্যায় (৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) এই বিবরণের ৫৯৭ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের সদস্য, বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকগণ এই বৎসরে পরিষদে বসিয়া ৭১খানি পুথি দেখিয়াছেন; এসিয়াটিক সোসাইটিকে একখানি পুথি ধার দেওয়া হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণা বিভাগের (Department of Oriental & African Studies) অধ্যাপক টি. ডব্লু. ক্লার্ককে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত গবেষক এডওআর্ড ডিমক্‌কে ৩খানি পুথির মাইক্রোফিল্ম প্রতিলিপি লইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ

১। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রন্থাবলীর 'বিবিধ খণ্ড' ও 'ভুল' নামক গ্রন্থ, সাহিত্যসাধক চরিতমালার নূতন দুইটি গ্রন্থে ৯৫।৯৬ (লেখক: শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল) এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাবলী শেষ (ষষ্ঠ খণ্ড—বিবিধ রচনাবলী) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং রামেন্দ্ররচনাবলীর প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সাধারণ তহবিল হইতে একখানি পুরাতন পুথি 'বাশুলীমঙ্গলে'র মূল অংশের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' এবং সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত ২, ৮, ১৩, ১৫, ১৭, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫১ ও ৭১ সংখ্যক গ্রন্থ এই তহবিল হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

(গ) ঝাড়গ্রাম রাজ তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায় নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্যবর্ষে পরিষদে পত্রিকার ৬৩তম বর্ষের দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০; রচনার সংখ্যা বিষয়ানুসারে এইরূপ—মঙ্গলকাব্য ৪টি, পুথির বিবরণ—২টি, ভাষাতত্ত্ব—১টি ইতিহাস—৪টি।

চিত্রশালা

আলোচ্যবর্ষে শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত ৫৩টি পাথরের পুরাতন মূর্ত্তি অথবা মূর্ত্তির অংশবিশেষ পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিগুলি সহ চিত্রশালার অন্যান্য প্রত্ন-সামগ্রী উপযুক্ত ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্যবর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে সাহিত্যিকের দুঃস্থা বিধবা ৫ জন এবং মহিলা সাহিত্যিক একজন—মোট ছয়জনকে মাসিক ৬৲ (ছয় টাকা) হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ব্যয়ের তুলনায় এই তহবিলের আয় যথেষ্ট না হওয়ায় প্রতি বৎসর সাধারণ তহবিল হইতে ঋণ লইয়া এবং দুই একজন সদাশয় ব্যক্তির সাময়িক দান গ্রহণ করিয়া এই তহবিলের কাজ চালান হইতেছে।

শাখা পরিষৎ

আলোচ্যবর্ষে মেদিনীপুর, ভাগলপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর ও নৈহাটি শাখার অধিবেশনাদির খবর পাওয়া গিয়াছে। নূতন কোন শাখা স্থাপিত হয় নাই।

আর্থিক সহায়তা

গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য পূর্ব্বে উল্লিখিত ১৮০০০৲ (আঠারো হাজার) টাকা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তক প্রকাশ ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' মুদ্রণের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও দুই দফায় ২০০০৲ (দুই হাজার) ও ১২০০৲ (এক হাজার দুইশত টাকা দিয়াছেন। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান ১৯৫৩.৫৪ ও ৫৪।৫৫ সালের সাহায্য বাবদ এই বৎসরে ১৫০০৲ (এক হাজার পাঁচ শত) টাকা দিয়াছেন।

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমরঞ্জন বসু ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন বিষয়ক মতি (vote) গণনা করিয়াছেন। শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী ও শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান, শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী এবং শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় প্রভৃতির দানের জন্য এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ ও সহকর্ম্মীদের নানারূপ সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

২৪ শ্রাবণ ১৩৬৪

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু
সম্পাদক

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—মন্দিরের চাবি (স্বরচিত)। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু—অথ বর্ণ-পরিচয় কথা (নারায়ণ চৌধুরী), Early Bengali Saiva Poetry (আশুতোষ ভট্টাচার্য্য), বাণীরেখা (সুরেন্দ্রলাল রক্ষিত), সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ও সঙ্গীত সার সংগ্রহ (প্রজ্ঞানানন্দ), Centenary Volume, Presidency College, উদাসী (সুখেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়) আসা যাওয়ার পথের ধারে (শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, Everest (S. M. Goswami), Krishnanath College Centenary Volume। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু—জলধর সেনের আত্মজীবনী (স্বরচিত)। শ্রীতৃপ্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মাতৃগীতা। শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (স্বরচিত)। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়—স্মৃতিপূজা গ্রন্থমালা ১ম+২য়, প্রেমপুষ্পাঞ্জলি, ভগবদ্গীতি কুসুমাঞ্জলি, শ্রীশ্রীব্রজবিহার কাব্য, ভক্তিকুসুমাঞ্জলি, প্রবন্ধাবলী, ধর্ম্মসঙ্গীত সংগ্রহ, চরিত্রচিন্তারত্ন গ্রন্থ, বড়োকী প্রার্থনা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—Figaro Salon, The A. B. C. of Indian Art, The A. B. C. of Japanese Art, Greek Art on Greek Soil, The Influences of Indian Art। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনখানি চীনা পত্রিকা, দুইখানি চীনা পুস্তক, Steeled in Battles Charges in the villages, Six A. M., Son of the Working Class, The White Hared Girl, The Womens Representative, Dragon Beard Ditch, The Plains are Ablaze, The Harricane, Chu Yuan, The Dragon Kings Daughter, Li Saw, Well of Bronze। শ্রীবিভাময়ী বসু—প্রবাসী (১৩৪৭, ১৩৪৮, ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ১৩৫৪ (২য় খণ্ড), ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৫৭ (২য় খণ্ড); শনিবারের চিঠি ১৩৪৩ (কার্ত্তিক-চৈত্র), ১৩৪৪, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৭, ১৩৪৮, ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ১৩৫৪, ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৫৭ (বৈশাখ-আশ্বিন); সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (১২।১৩।১৪।১৫।১৬ খণ্ড), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : (১৩।১৫।১৬। ১৭।১৮।২১।২২) ভাগ। শ্রীচারুশীলা সেন—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্. (বসুমতী সং), পরম-পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১ম খণ্ড), পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি, (অচিন্ত্য সেনগুপ্ত) শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থমালা (১ম খণ্ড), শ্রীরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতে স্বাধীনতার ইতিহাস (স্বরচিত)। প্রেম সহচরী (উদ্ধবদাস), শ্রীক্ষেত্র (সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ), চরিতসুধা ২।৩।৪।৫।৬ (রামদাস বাবাজী), গীতগোবিন্দ (বিরজাশঙ্কর দাস)। মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার—'পঞ্চাশৎ স্মরণী' পুস্তিকা। শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব—জন্ম মাস বিচার (স্বরচিত)। ইউ. এস. আই. এস.—পরমাণু রহস্য (গর্ডন এডামস ডীন), মুক্তির উজানে (ভীড্যাম ও ওয়াল)। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ—রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়), শিল্পচর্চা (নন্দলাল বসু), বাংলার স্ত্রী আচার (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী), রাশিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

(পূর্ণেন্দুকুমার বসু), সাহিত্য প্রকাশিকা (২ খণ্ড বাংলার জাগরণ (আবদুল ওদুদ) রসায়ন ও সভ্যতা (প্রিয়দারঞ্জন রায়), নবযুগের ধাতু চতুষ্টয় (জগন্নাথ গুপ্ত), প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা (রমেশচন্দ্র মজুমদার), শেফালি (স্বরবিতান ৫০)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার—Indian Temple Sculpture (A. Goswami)। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন নিউদিল্লী—Textiles and Ornaments of India। শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার—হাসির তুবড়ি (স্বরচিত)। বরেন্দ্র বিসার্চ সোসাইটী—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম Vol. I-II। শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত—গীতা। শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়—জীবন বেদ (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন), Lectures in India (ঐ), Synthesis of Religion (B. C. Ghose), Lectures in America (P. C. Mozumdar)। অ্যালবার্ট ব্রিল (যুক্তরাষ্ট্র)—Fundamental Fundamentals (স্বরচিত)। শ্রীঅরবিন্দ দত্ত—গ্রন্থাবলী (স্বরচিত)। সাহিত্য একাডেমী—Contemporary Literature। ভারত সরকার শিক্ষা বিভাগ—Libraries in India (1951)। গীতা প্রেস-গোরক্ষপুর—কল্যাণ। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধক কমলাকান্ত (স্বরচিত)। শ্রীপ্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়—হরপ্রসাদ রচনাবলী (১ম), রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ—Paper Trade Manual। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—Dacca University Act (1953), Eastern Humanism (S. Levy), Absorption of the Vratyas (H. P. Sastri), The Meaning of Art etc. (R. N. Tagore), The Art of War in Ancient India (P. C. Chakravorty), শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্, কীচকবধ ও পদ্মাবতী (সুশীলকুমার দে সং) Dacca University Calender (Vol. I), Concepts of Riti and Guna in Sanskrit Poetics (P. C. Lahiri), ভবানন্দের হরিবংশ (সতীশচন্দ্র রায়) Puranic Records on Hindu Rites Customs (R. C. Hazra), History of the Paramara Dynesty (D. C. Ganguly)। গীতা ভারতী মিশন (নোয়াখালী)। ঐশ্বর (প্রেমানন্দ)। শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—Study of changes in Traditional Culture (স্বরচিত)। B. B. C London—B. B. C. Hand Book 1957। শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ রেউ—বিশ্বেশ্বর স্মৃতি। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তারা ও ফুল, নবমেঘদূত ভৈরবী, যুগসন্ধি, (স্বরচিত)। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ—সহজ সাধন (স্বরচিত) শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য—বাংলা দেশের গ্রন্থাগার (১ম খণ্ড)। শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত—মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ), শব্দকল্পদ্রুম (রাধাকান্ত দেব), মহাভারত-আদি, ভীষ্ম, দ্রোণ, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, (বর্দ্ধমান সং), রামায়ণ (গদ্য) বঙ্গবাসী, গ্রন্থাবলী (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর), সেক্সপিয়র—৩য়-৪র্থ খণ্ড (হারাণচন্দ্র রক্ষিত), বিদ্যাসাগর (বিহারীলাল সরকার), বন্ধু আমার, মুদীর দোকান ও সন্ধ্যায় (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর), হেমজ্যোতি (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর), গিরিশচন্দ্র বা গিরিশপ্রসঙ্গ (অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়)। অনাদিভূষণ দাস—দশমহাবিদ্যা-১ম (হেমচন্দ্র) রাজা শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী (শশিশেখরেশ্বর রায়),

বর্ত্তমান ভারত ও ইংরাজ শাসন (ব্রজমাধব বসু), আমাদের স্বরাজ (গান্ধী), শ্রীমহাভারতের বৃহৎ সূচী (জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ), হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন (বিনয়কুমার সরকার), ফিরিঙ্গি বণিক (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়), সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (অভয়কুমার গুহ), বর্ষশেষ (চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়), গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি, বিধবা বিবাহ (গান্ধী), হিন্দু সমাজ (অনাদিচরণ তরফদার), বিশ্বভারত (২য় খণ্ড) (রাধাকমল মুখোপাধ্যায়), আর্য্যধর্ম্ম (ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী), ব্রহ্মচর্য্য (স্বামী ত্রিগুণাতীত), সত্যের সাধন (চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য), (শ্রীকেদারনাথ ভারতী), শিক্ষা না সেবা (অনু-হীরেন্দ্রনাথ দত্ত), ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর (শ্রীনাথ চন্দ), ইতিবৃত্ত তত্ত্ব (প্যারীমোহন দাস), অধ্যয়ন ও সাধনা (প্রফুল্লচন্দ্র রায়), শিক্ষাবিজ্ঞান-১। ২।৩ ভাগ (বিনয়কুমার সরকার) বলশেভিকী (পুলকেশ দে), চা (শচীন্দ্রনাথ ঘোষ), কন্যাশিক্ষা সোপান (শাস্ত্রপ্রকাশ সমিতি), আমার জীবন ১ম (নবীনচন্দ্র সেন), বাল গঙ্গাধর তিলক, গান্ধীজির জীবন প্রভাত (বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য), পরলোকের পত্র (অম্বিকাচরণ গুপ্ত), পঞ্চামৃত (তারাকুমার কবিরত্ন), বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার (প্রফুল্লচন্দ্র রায়), স্মৃতিতর্পণ (পূর্ণচন্দ্র রায়), হাসির হল্লা (যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য), একমেবাদ্বিতীয়ং (ব্রহ্মসঙ্গীত), স্ত্রী স্বাধীনতা (যদুনাথ দে), হিন্দু ডুবিল (কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), কপালকুণ্ডলা (সংক্ষিপ্ত), সঙ্গীত তরঙ্গ (রাধামোহন সেন), আসাম ও বঙ্গদেশে বিবাহ পদ্ধতি (বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী) দ্বিজেন্দ্রলাল (উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ), শ্রীপতিতোদ্ধার কাব্য (নগেন্দ্রচন্দ্র দাস)। কাদম্বরী (তারাশঙ্কর তর্করত্ন), পথস্মৃতি (সুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী), সাধনা (বিনয়কুমার সরকার), বিদ্যাকল্পদ্রুম-১ম (কালীবর বেদান্তবাগীশ), পাকরাজেশ্বর (নৃত্যলাল শীল প্র°), মীরকাসিম (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়), শঙ্করাচার্য্যচরিত (শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী), কুমারসম্ভব কাব্য (দীননাথ সা), মানবগীতা (যোগীন্দ্রনাথ বসু), ভারত প্রদক্ষিণ (দুর্গাচরণ রক্ষিত), ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার (বীরেশ্বর পাঁড়ে), প্রাচীন ভারত ১।২।৩ খণ্ড (যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার), অভিব্যক্তিবাদ (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর), রাম বনবাস (শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ), আর্য্যসভ্যতা (শশধর রায়), বেদান্ত সূত্র (যদুনাথ মজুমদার), পদ্মা ও দীপালী (প্রমথনাথ রায়চৌধুরী), স্বাস্থ্য-তত্ত্বম্ (গোবিন্দপ্রসাদ রায়), নীলমাণিক (দীনেশচন্দ্র সেন), সারনাথের ইতিহাস (বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য), তীর্থের পথে (সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী), রাজতরঙ্গিণী (নিবারণচন্দ্র বিদ্যারত্ন), গৌড়ীয় ঔষধাবলী (গোরাচরণ পাল), গীতাভাস (বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী), কান্তকবি রজনীকান্ত (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত), ভারতবর্ষ (দুর্গাদাস লাহিড়ী), সীতা (অবিনাশচন্দ্র দাস), ললিত প্রসঙ্গ (হরনাথ বসু), সতীশতক (নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী), পরমার্থ সঙ্গীত রত্নাকর (হরিশ্চন্দ্র দত্ত প্র°), উচ্চ শিক্ষক সহচর (দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী), মৈথিলী মিলন নাটক (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়), লুপ্ত সংবৎসর নিরসন (যদুনাথ ন্যায়রত্ন), ব্রাহ্মণ্য সম্পদ (শশিশেখরেশ্বর রায়), রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত (জয়নাথ চৌধুরী), বঙ্গীয় নাট্যশালা (ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়), হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ (শ্রীনাথ ঘোষ), ভীষ্ম মহাদর্শন, কৌতুক বিলাস (শ্যামাচরণ দ্বিজ), ভার্গব-বিজয় কাব্য (গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী), কিরাতার্জ্জুন-১ম (নবীনচন্দ্র দাস), প্রাচীন ভূগোল খগোল বিবরণ (দুর্গাচন্দ্র সান্যাল), শ্রীমহানাটক (মধুসূদন মিশ্র), বক্তৃতা (কেশবচন্দ্র সেন), কৃষকসন্তান (অম্বিকাচরণ গুপ্ত), জগন্নাথবল্লভ নাটক, দেশমাতৃকা পূজা (শশিশেখরেশ্বর রায়), শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থমালা, হংসদূতম্ (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স°) পদাঙ্কদূতম্ শ্যামাচরণ কবিরত্ন সং ব্রজবিলাস (বিদ্যাসাগর), প্রমীলাবিলাপ নাটক (সুরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), শঙ্করাচার্য্য, ভারত সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (রামদয়াল মজুমদার), কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ, সনাতন ধর্ম্ম, সৌরভ (প্রমোদকান্ত বসু), হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব।

চতুঃষষ্টিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের তালিকা

সভাপতি

শ্রীসুশীলকুমার দে, ১৯।এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪ — অধ্যাপক

সহকারী সভাপতি

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, ৪২, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ — সাহিত্যিক
" নরেন্দ্র দেব, ৭২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ — ঐ
" নির্মলকুমার বসু, ৩৭ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩ — অধ্যাপক
" বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, গোলকুঠি, আদমপুর, ভাগলপুর, বিহার — সাহিত্যিক
" বিমলচন্দ্র সিংহ, ২২৭।২ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-২০ — বিষয়ভোগী
" যদুনাথ সরকার, ১০ লেক টেরেস, কলিকাতা-২৯ — অধ্যাপক
" সজনীকান্ত দাস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ — সাহিত্যিক
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ — অধ্যাপক

সম্পাদক

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পি ৭০ সি. সি. ও. এস. কলিকাতা-২ — ব্যবসায়ী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৯।এ শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, দমদম, কলিকাতা-৩০ — অধ্যাপক
" প্রবোধকুমার দাস, ৭।১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬ — চাকুরিজীবী
" মনোরঞ্জন গুপ্ত, ৯।ই যোগোদ্যান লেন. কলিকাতা-১১ — ঐ
" সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ — ঐ

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ — বিষয়ভোগী

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ২৬ পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ — অধ্যাপক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ২৮।৩।বি সাহানগর রোড, কলিকাতা-২৬ — অধ্যাপক

পুথিশালাধ্যক্ষ

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৩৩ ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট, কলিকাতা — আইনজীবী

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, ৫৯ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২ বিষয়ভোগী

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

শ্রীআমিনুর রহমান, ৪৫, দিলখুসা স্ট্রীট কলিকাতা-১৭ চাকুরিজীবী
" রেভাঃ এ. দোঁতেন, সেণ্ট জোসেফ চার্চ, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা ধর্মযাজক
" কামিনীকুমার কর রায়, ৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ চাকুরিজীবী
" কুমারেশ ঘোষ, ৪৫।এ, গড়পার রোড—কলিকাতা-৯ ব্যবসায়ী
" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫০।৮০।সি গৌরী বাড়ী লেন, (তিনতলা) কলি-৪ গবেষক
" চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ২৪।এ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ সাংবাদিক
" জগদীশ ভট্টাচার্য, ৩৫ স্কটস্ লেন, কলিকাতা-৯ অধ্যাপক
" জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. ২৫৬ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী
" জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০ ব্যবসায়ী
" নরেন্দ্রনাথ বসু, ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ চাকুরিজীবী
" পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ ঐ
" পুলিনবিহারী সেন, ৫৪।বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ ঐ
" মনোমোহন ঘোষ, ৯২।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪ ঐ
" মন্মথনাথ সান্যাল, ৪০।বি নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১ সাংবাদিক
" যোগেশচন্দ্র বাগল ১২০।২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা-৯ চাকুরিজীবী
" লীলামোহন সিংহ রায়, ১।১এ, উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ বিষয়ভোগী
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪৩, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি স্ট্রীট—কলিকাতা-৬ চাকুরিজীবী
" শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ ব্যবসায়ী
" সুরেশচন্দ্র দাস, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ঐ
" সুশীল রায়, ১৩।বি কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ চাকুরিজীবী

শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি

শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পঞ্চাননতলা, নৈহাটী ২৪ পরগণা শিক্ষক
" চিত্তরঞ্জন রায়, পি ৮ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০ ব্যবহারজীবী
" মাণিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, শিক্ষক
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৪৭ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া—হুগলী অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী

পৌরসভার প্রতিনিধি

ডাঃ শ্রীকানাইলাল দাস, ৫৫।বি বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ চিকিৎসক

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুঃষষ্টিতম বর্ষ : ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

চতুঃষষ্টিতম বর্ষ : ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বিষয়-সূচী

পঞ্চানন্দ ক লপাড় জিলপুর

দক্ষিণ ভারতে পূ পঞ্চ ন্দর অনুরূপ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৪ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
১৩৬৪
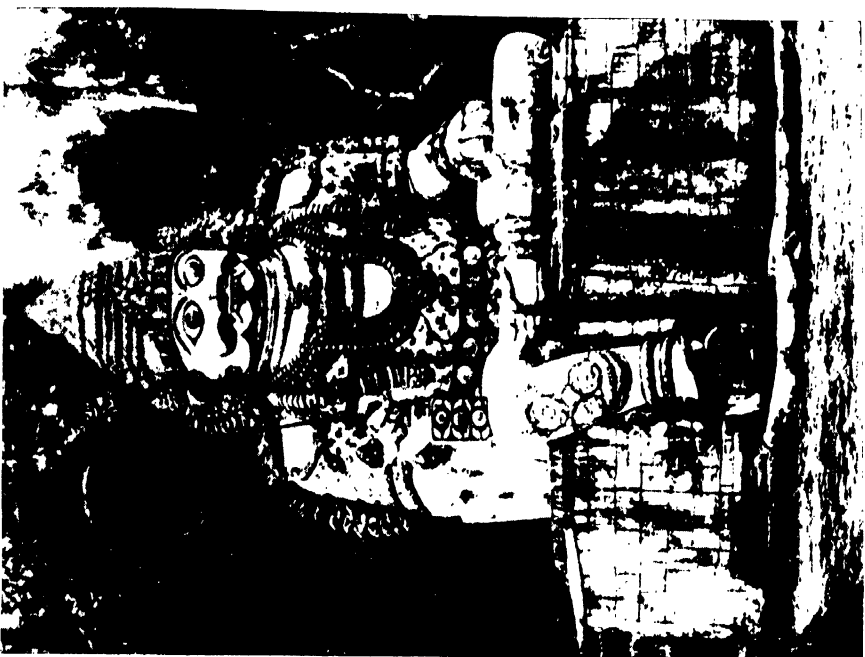
পঞ্চানন্দের গান

শ্রীকালিদাস দত্ত

এই প্রবন্ধের সহিত পঞ্চানন্দের গান নামে দক্ষিণ-চব্বিশপরগনা জেলায় প্রচলিত একটি প্রাচীন লোকগাথা প্রকাশিত হইল। উহাতে দক্ষিণ-চব্বিশপরগনার প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ঐ দেবতাটির পূজা উপলক্ষে এখনও গায়েন নামে এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা উহা গাহিয়া থাকেন।

দক্ষিণ-চব্বিশপরগনার প্রতি গ্রামে উক্ত পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুরের আস্তানা আছে। বড় বড় গ্রামে আবার উহার সংখ্যা একাধিক। ঐ দেবতার পরিচয় অজ্ঞাত। সাধারণ লোকে কোথাও তাঁহাকে পঞ্চানন্দ, আবার কোথাও বাবাঠাকুর নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমান সময় ব্রাহ্মণেরাই তাঁহার পূজারী। তাঁহারা পঞ্চানন বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেন। কেহ কেহ আবার তাঁহাকে শিবের পুত্র বলেন। এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত গানে কিন্তু পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন, উক্ত দুই নামেই তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। পঞ্চানন্দ কথাটির ব্যুৎপত্তি কি, তাহাও অজ্ঞাত। কাহারও কাহারও মতে উহা পঞ্চানন শব্দের গ্রাম্য অপব্যবহার[১]।

উক্ত পঞ্চানন্দ যে এককালে দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসীদের নিজস্ব দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার মূর্ত্তিতে এখনও আদিম ভাব দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বাবাঠাকুর নামটিও আদিম ভাবব্যঞ্জক। উহাই বোধ হয় তাঁহার প্রাচীন নাম। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী কালে তাঁহার পূজারী হইলে তাঁহাকে পঞ্চানন নামে আখ্যাত করেন এবং তদবধি তাঁহার উক্তরূপ দুইটি নামই চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার একটি ধ্যানও রচনা করিয়াছেন। উহা এই,

"দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণাসাগরং বিভুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্॥
লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্।
ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং ভজে॥"

এই ধ্যানটি কোন প্রাচীন পুস্তকে নাই, পঞ্চানন্দের পুজারীদের মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

অধুনা দক্ষিণ-চব্বিশপরগনার সর্ব্বত্র ঐ দেবতাটির মূর্ত্তি এক মল্লের আকারে সাধারণতঃ একটি উচ্চ বেদীর উপর কোথাও দক্ষিণ পা, আবার কোথাও বা বাঁ পা মুড়িয়া ও অন্য পা ঝুলাইয়া উপবিষ্ট অবস্থায় গঠিত হয় এবং একটি হাত ঐ প্রকারে নির্ম্মিত পায়ের গোড়ালীর উপর ও অন্য হাতটি হাঁটুর উপর রক্ষিত থাকে। তাঁহাব দেহ নগ্ন ও রক্তবর্ণ, পরিধানে

১। সরল বাঙ্গলা অভিধান,—সুবলচন্দ্র মিত্র।

ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মস্তকের কেশরাশি বেণীর আকারে গুটাইয়া সজ্জিত, মুখে দীর্ঘ ঘন গোঁফ, চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উন্মুক্ত এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটি কলিকাফুল দেখা যায় (চিত্র ১)।

দক্ষিণ-ভারতে তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যে উক্ত দেবতাটির অনুরূপ একটি দেবতা আজিও পূজিত হয়। উহার একটি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি তুলনার জন্য এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল (চিত্র ২)। দক্ষিণ-ভারতের অনার্য্য দ্রাবিড়বংশোদ্ভব তামিল ও তেলেগু জাতির উপাস্য উক্ত লৌকিক দেবতাটির সহিত উল্লিখিত পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুরের আকারের সাদৃশ্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণ-বঙ্গেও প্রাচীন কালে তামিল ও তেলেগু জাতির পূর্ব্বজগণের অনুরূপ ধর্ম্মভাবাপন্ন আদিম মানবগণের বাস ছিল।

আদিম জাতির উপাস্য বলিয়াই বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে ব্রাহ্মণদের দেবমন্দির মধ্যে স্থান দেওয়া হয় না এবং সর্ব্বত্র হয় কোন বৃক্ষতলে মৃত্তিকার বেদীর উপর নতুবা পৃথক্ গৃহ বা আচ্ছাদনমধ্যে রাখা হয়। তাঁহার ঐরূপ আস্তানা ইদানীং দক্ষিণ-চব্বিশপরগনায় থান নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত থান শব্দ সংস্কৃত স্থান শব্দের অপভ্রংশ।

অধুনা সাধারণ লোকে ঐ দেবতাটির নিকট বালকদের জ্বর, পেঁচোয় পাওয়া (ধনুষ্টঙ্কার) প্রভৃতি কতকগুলি রোগমুক্তির জন্য মানত বা মানসিক করেন এবং তাহা সফল হইলে আমিষ নৈবেদ্য ও ছাগবলি দিয়া তাঁহার পূজা দেন। এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত গানে তজ্জন্য তাঁহাকে বেধ্যের (ব্যাধির) ঈশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে আরো দেখা যায়, ঐ সকল ব্যাধিই তাঁহার অনুচর এবং জ্বরাসুর মহাপাত্র।

নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানবেরাই ঐরূপ দেবতার সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের তখন বিশ্বাস ছিল যে, অদৃশ্যে বহু অশরীরী জীবগণই যাবতীয় জাগতিক ঘটনার সৃষ্টিকারক এবং তাঁহাদের অসন্তোষেই মানবগণের জীবনে নানারূপ রোগ ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি বিপদ্ আপদ্ সংঘটিত হয়। সে কারণ তাঁহারা ঐ সকল অশরীরী জীবের অসন্তোষের ভয়ে তাঁহাদের কাল্পনিক প্রতীক নির্ম্মাণ করিয়া প্রার্থনা ও জীববলি প্রভৃতির দ্বারা তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন এবং মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সকলকে ঐরূপ দেবতাদের সন্তোষকর কার্য্যে নিয়োজিত করাইবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ভীতিসঞ্চারক গাথা রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেন। উহাই ছিল উল্লিখিতরূপ দেবতা সৃষ্টি, গাথা রচনা ও প্রচারের কারণ।

এতৎসহ প্রকাশিত পঞ্চানন্দের গানটি ঐ শ্রেণীর একটি আদিম গাথার নিদর্শন। উহার ভাষা দক্ষিণ-চব্বিশপরগনার আধুনিক চলতি গ্রাম্য ভাষার ন্যায় হইলেও প্রকাশভঙ্গী ও রচনাপ্রণালী খুব প্রাচীন ও দেবচরিত্রও আদিম ধরণের। পূর্ব্বে উহা লোকমুখে প্রচলিত থাকায় ক্রমশঃ দেশের ভাষা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রাচীন ভাষাও রূপ বদলাইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উহার প্রকাশভঙ্গী, রচনাপ্রণালী ও দেবচরিত্র মোটামুটি ঠিক রহিয়া গিয়াছে। উহাতে দেখা যায়, দেবতা পঞ্চানন্দ নিজ পূজা প্রচারের

জন্য লোককে গুণে আকৃষ্ট না করিয়া, আদিম আদর্শানুযায়ী তাঁহার অনুচর ব্যাধিদের দ্বারা বিপন্ন ও ভীত করিয়া ভক্ত করাইতেছেন।

উক্ত গানে উহার রচয়িতা দ্বিজ রামানন্দের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু উহাতে তাঁহার অন্য কোন পরিচয় নাই। উহার শেষাংশে সওদাগরের দক্ষিণ সফরের বিবরণে গঙ্গাতে স্নান, নদীর জোয়ারে নৌকা ছাড়া ও জোয়ার ভাটা না মানিয়া নৌকা পরিচালনা প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি দক্ষিণ-চব্বিশপরগনা অঞ্চলের কথাই বলিয়াছেন।

উহাতে আরো দেখা যায় যে, পদ্মমালা নামক একটি গ্রামে দেবতা পঞ্চানন্দের পূজার প্রবর্ত্তন হয় এবং উক্ত সওদাগর সফর শেষে দেশে আসিয়া জোয়ারভাটাবিশিষ্ট এক নদী হইতে সেই গ্রামে অবতরণ করেন। অধুনা ঐরূপ নদীর সান্নিধ্যে দক্ষিণ-চব্বিশপরগনায় কিন্তু ঐ নামে কোন জনপদ নাই। ঐ প্রদেশের সমগ্র দক্ষিণাংশ পূর্ব্বে ব্যাঘ্র ও গণ্ডারাদি শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া বনময় অবস্থায় ছিল এবং বহুদিন উহা ঐ প্রকারে দুর্গম থাকায় তথাকার প্রাচীন জনপদসমূহের নাম অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। সে কারণ প্রাচীন কালে সেখানে ঐ নামে কোন জনপদ থাকিলে তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। উহাতে অন্যান্য যে সকল স্থানের নাম আছে, সেগুলিরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময় বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে এবং হাওড়া ও হুগলী জেলারও কতকগুলি গ্রামে শিবঠাকুরের ন্যায় পঞ্চানন ঠাকুর নামে একটি লৌকিক দেবতা পূজিত হন। কেহ কেহ ঐ দেবতাটি ও দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার উল্লিখিত পঞ্চানন্দ ঠাকুর অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন[১]। কিন্তু উক্ত পঞ্চাননের ধ্যানের সহিত দক্ষিণ-চব্বিশপরগনার পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মূর্ত্তির মিল নাই। ঐ ধ্যানে বর্ণিত পঞ্চানন্দ পদ্মাসনস্থ ও গোমুগবাহন-বেষ্টিত এবং তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা আছে[২]। শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় বর্দ্ধমান অঞ্চলের ঐরূপ পঞ্চাননকে বৃক্ষাধিষ্ঠাতা ভৈরব বা ক্ষেত্রপাল বলিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচায়ক পঞ্চাননমঙ্গল ও পঞ্চাননের ব্রতকথা নামে দুইখানি পুঁথিরও উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। বৃহদ্রুদ্রযামল নামক সংস্কৃত গ্রন্থে পঞ্চাননের মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে।[৪]

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—শ্রীবিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ৪০৬।

২।   ঐ

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম—খণ্ড ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৯২।

৪। পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪৬ ভাগ, পৃ. ৯৯-১০৩।

পঞ্চানন্দের গান

বন্দনা

বন্দ পঞ্চানন্দ রায় প্রণতি তুমার পায় তুমি দেব বেধ্যের[1] ঈশ্বর।
তুমার মহিমা যত তাহা বা বলিব কত বিধিমতে মহিমা অপার ॥
কৈলাস শিখরে স্থিতি তুমি জগতের পতি তুমার মায়া বুঝিতে না পারি।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি তুমি দেব আইস দয়া করি ॥
অবোধ বালক ডাকে পদছায়া দাও মোকে আমি অতি দীনহীন জন।
ব্যেধগণ লয়ে সঙ্গে আসিয়ে পরম রঙ্গে আমায় প্রভু দাও দরশন ॥
নাহি জ্ঞান না জানি ধ্যান আমি অতি অজ্ঞান নিজগুণে দয়া কর মোকে।
তুমি দেব পঞ্চানন কে জানে তব সাধন আমি অধম চিনি না তোমাকে ॥
নিজগুণে করে দয়া দাসে দিয়ে পদছায়া উর বাবা আমার আসরে।
জুড়ি আমি দুই কর মাগি বাবা এই বর দয়া কর আমায় পায় করে ॥
কে জানে তুমার মায়া তুমি যারে কর দয়া তুমি যারে দাও শ্রীচরণ।
রণে বনে নাহি ভয় দ্বিজ রামানন্দ কয় মোর নায়কের প্রভু কর গো কল্যাণ ॥

গীত

কৈলাস শিখরে বসে পঞ্চানন্দ রায়। জরাসুর পাত্র ডেকে বলেন তাহায় ॥
শুন পাত্র জরাসুর আমার বচন। পৃথিবীতে হল না মোর পূজা প্রচারণ ॥
এ সকল কথা হেথা শুকিত[2] রাখিয়া। পদ্মমালা গ্রামের কথা শুন মন দিয়া ॥
পদ্মমালা গ্রামে আছে দুরলভ রাজন। পুত্র নাহি মহারাজের বিষাদিত মন ॥
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বসে সভা করি। হেন কালে আইল একজন ভিখারি ॥
রাজা বলে ভিখারি গো আমার কথা নাও। এখানে দাঁড়ায়ে কেন অন্তঃপুরে যাও ॥
এত শুনি ভিখারি তো করিল গমন। অন্তঃপুরেতে গিয়ে দিল দরশন ॥
মহারাজের জয় হোক বলিতে লাগিল। ঘরে বসে রাণী তাহা শুনিতে পাইল ॥
ভিক্ষা লয়ে রাণী তবে করিল গমন। ভিখারির কাছে আসি দাঁড়াল তখন ॥
ভিক্ষা না লইয়ে সে ফিরে চলে যায়। রাণী তা দেখিয়ে দুঃখে বলে হায় হায় ॥
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে রাণী ঘরে ফিরে গেল। বিরস বদনে রাণী বসিয়ে রহিল ॥
রাজা সভা ভঙ্গ করে অন্তঃপুরে যায়। কেঁদে কেঁদে রাণী তখন রাজার কাছে কয় ॥
ভিখারি আসিয়ে হেথা ভিক্ষা নাহি নিল। আঁটকুড়া বলে মোরে কোথা চলে গেল ॥
রাজা শুনে বলে রাণী শুন গো এখন। এ ছার জীবনে মোদের নাহি প্রয়োজন ॥

১। বেধ্যের অর্থাৎ ব্যাধির। ২। শুকিত অর্থাৎ স্থগিত।

ভাবিতে ভাবিতে দিন গত হয়ে গেল। প্রভাতে উঠিয়া রাজা সভা ডাকাইল ॥
পাত্র মিত্র সবে তখন করিল গমন। একে একে সভামাঝে দিল দরশন ॥
বিরস বদনে আছে রাজা নরপতি। মহাপাত্র দেখে তাহা কহে শীঘ্রগতি ॥
মহারাজ আজ কেন দেখি অলক্ষণ। কি কারণে বসে তুমি বিরস বদন ॥
রাজা বলে মহাপাত্র মনে বড় দুখ। আজিও না দেখিলাম পুত্রকন্যার মুখ ॥
পাত্র বলে মহারাজ শুন আমার বাণী। তার জন্য ভাবনা কেন করিবে আপনি ॥
পুত্রকন্যা হয় নাই পূর্ব্ব কর্ম্মফলে। বিধির নিবন্দ[১] উহা ভাবিলে কি চলে ॥
না ভাবিও মহারাজ শুন আমার বাণী। পালকপুত্র রাখ তুমি কহিলাম আমি ॥
রাজপাট রক্ষা হবে শুন মহাশয়। উপযুক্ত পণ দিয়ে শিশু কর ক্রয় ॥
রাজা বলে মহাপাত্র বলি তোমার ঠাঁই। পালিলে পরের পুত্র আপন হবে নাই ॥
রাং নয় রে পিতল পিতল নয় রে সোনা। পালিলে পরের পুত্র না হয় আপনা ॥
যা আছে কপালে হবে তোমায় কিবা কব। রাজরাণী সঙ্গে করে বনবাসে যাব ॥
পাত্র বলে মহারাজ কব এই ঘড়ি। তুমি বনে গেলে মোরা কেমনে রাজ্য করি ॥
রাজা বলে আমি যবে যাইব কানন। রাজপাটে বসে প্রজা করিবে পালন ॥
পঞ্চুদেব যদি আমার মানস পূর্ণ করে। আবার পাইবে মোরে কহিলাম তোমারে ॥
এত বলি মহারাজ চলে শীঘ্রগতি। বনেতে যাইতে রাজার উপজিল মতি ॥
রাজরাণী সঙ্গে করে বনে চলে যায়। রাজ্যমাঝে যত লোক করে হায় হায় ॥
রাজার শোকেতে সবার কাতর হৃদয়। গহন কাননে রাজা উপনীত হয় ॥
রাজরাণী সঙ্গে আছে বিরস বদন। বনে বনে দুজনায় করেন ভ্রমণ ॥
বনমাঝে থাকি তারা বড় দুঃখ পায়। বনে বসি দুজনায় বলে হায় হায় ॥
দুই চার মাস ক্রমে গত হয়ে যায়। পঞ্চুদেব বলে দোঁহে কাঁদে উভরায় ॥
বলে এ বিপদে রাখ প্রভু দেব পঞ্চানন। তব নাম লয়ে নচেৎ ত্যজিব জীবন ॥
কৈলাসেতে বসে আছেন দেব পঞ্চানন। ধেয়ানে জানিয়ে সব ভাবেন তখন ॥
জরাসুর পাত্রে ডেকে বলেন বচন। যাও তুমি যেথা আছে দুরলভ রাজন ॥
শুনি তাহা জরাসুর মন স্থির করে। ব্রাহ্মণের বেশ ধরে যায় ধীরে ধীরে ॥
বনের মাঝেতে গিয়ে উপনীত হয়। রাজরাণী কাঁদিতেছে দেখিবারে পায় ॥
জিজ্ঞাসা করিয়ে তিনি জানেন তখন। কি কারণে দুজনায় কাঁদিছে অমন ॥
জানি তাহা জরাসুর কৈলাসেতে গেল। রায়মণির কাছে গিয়ে কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন রায়মণি বলি তোমার ঠাঁই। তুমি যে বলিয়াছিলে মোর ভক্ত নাই ॥
পদ্মমালা গ্রামে থাকে দুরলভ রাজন। পুত্র নাই বলে অমন করিছে রোদন ॥
এত শুনি রায়মণি উঠিয়ে তখন। গহন কাননে গিয়ে উপনীত হন ॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ধীরে ধীরে যান। দুরলভ রাজনে সেথা দেখিবারে পান ॥

১। নিবন্ধ অর্থাৎ নির্ব্বন্ধ।

সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল। রায়মণি মহারাজে কহিতে লাগিল ॥
কে তোমরা রহিয়াছ গহন কাননে। পরিচয় দেহ আজ আমার সদনে ॥
রাজা বলে বাস মোর পদ্মমালা গ্রামে। সকলে ডাকয়ে মোরে দুরলভ নামে ॥
এত শুনি ধর বলি রাণীর হাতে ঔষধ দিল। ঔষধ দিয়ে সন্ন্যাসী হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হল ॥
স্নান করি রাজরাণী ঔষধ খাইল। বনমাঝে দুজনায় ভ্রমিতে লাগিল ॥
এক দুই তিন চার পাঁচ মাস হল। গর্ভবতী রাণী তখন জানিতে পারিল ॥
জানিতে পারিয়ে রাণী বলে মহারাজ। সন্ন্যাসীর ঔষধেতে হইয়াছে কাজ ॥
শুনিয়ে তা মহারাজ রাণীর কাছে কয়। আর বনের মাঝেতে থাকা উপযুক্ত নয় ॥
রাজা রাণী সাথে করে দেশে ফিরে গেল। নগর ভিতরে গিয়ে উপনীত হল ॥
রাজা দেখে সকলেতে আনন্দিত অতি। করজোড়ে সবে এসে করিল প্রণতি ॥
রাজপুরে রাজরাণী করিল প্রবেশ। অন্তঃপুরে রাণী গিয়ে পরিল সুবেশ ॥
যবে রাণী সাত মাস গর্ভবতী হয়। আনন্দেতে রাজা তখন রাণীর সাধ দেয় ॥
একশত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করায়ে রন্ধন। পায়েস পিঠা দিয়ে সাধ করাল ভক্ষণ ॥
গ্রাম মাঝে সবে নিমন্ত্রণ জানাইল। অতিথি ব্রাহ্মণ যত খাওয়াইয়া দিল ॥
দশ মাস দশ দিন হইল যখন। প্রসব বেদনায় রাণী কাতর তখন ॥
প্রসব বেদনায় রাণী বড় কষ্ট পায়। মাটিতে পড়িয়ে কেঁদে গড়াগড়ি যায় ॥
এতেক দেখিয়ে রাজা দাই ডাকাইল। দাই এসে রাণীরে প্রসব করাইল ॥
সুন্দর সুরূপ এক হইল তনয়। জানিয়ে তা মহারাজা ভারি খুসী হয় ॥
পাত্র মিত্র ডেকে রাজা কহিল তখন। নগর ভিতরে কর ধন বিতরণ।
ধনরত্ন করে দান দরিদ্র ব্রাহ্মণে। দান ধ্যান করিলেক আনন্দিত মনে ॥
দুই চারি ছয় মাস যবে গত হয়ে যায়। পুরোহিত ডেকে ছেলের অন্নপ্রাশন দেয় ॥
রাশ গণনা করে দেখিয়ে ব্রাহ্মণ। জানকী বলিয়ে নাম রাখিল তখন ॥
এক দুই তিন চার পাঁচ বছর হয়। গুরুকে ডাকিয়ে ছেলের হাতে খড়ি দেয় ॥
ক্রমে ক্রমে রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল। গুরুর পাঠশালে কত বিদ্যা না শিখিল ॥
এইরূপে কত দিন গত হয়ে গেল। পঞ্চানন্দের পূজা রাজা মনে না করিল ॥
কৈলাসেতে বসে থেকে দেব পঞ্চানন। জরাসুর পাত্র ডেকে বলিল বচন ॥
ব্রাহ্মণের বেশে তখন জরাসুর ধায়। রাজার সভাতে গিয়ে উপনীত হয় ॥
পঞ্চানন্দের কথা রাজায় করালে স্মরণ। রাজা তাহা না শুনিল হয়ে অন্যমন ॥
তখন সভা ছেড়ে জরাসুর রাগভরে যায়। রায়মণির কাছে এসে যত বেধোরে[১] ডাকয় ॥
তাহাদের সবে বলে জানকী ধরিতে। বেধোদের কথা এবে শুন এক চিত্তে ॥
ঝোড়ফুল মাথে দিয়ে যে পথে চলে যায়। দোকালীন ব্যেধ তার পশ্চাতে গড়ায় ॥
এলোচুলে যেই নারী বসন লুটায়। আঁচল ধরে সেই নারীর লাজায়[২] তার গায় ॥

১। বেধোরে অর্থাৎ ব্যাধিকে ২। লাজায় অর্থাৎ জড়ায়।

রক্তচোরা ব্যেধ বলে যদি পাই দুপুর বেলা। শূন্যভরে গিয়ে তার চেপে ধরি গলা ॥
আমি গিয়ে যখন তার চেপে ধরি পাটি। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে কুটি কুটি ॥
খেঁচুনে ব্যেধ বলে আমি যাই যথা। গাঁটে গাঁটে খেঁচুনি দি মুচড়ে ফেলি মাথা ॥
করুণ্ডে ব্যেধ বলে আমি সকল বেধ্যের খুড়ো। কোলে উঠে বসে থাকি বিচধানের পুড়ো ॥[১]
জরাসুর ব্যেধ বলে জ্বর দিতে পারি। জ্বরের তেজেতে আমি হাড় গুঁড়ো করি ॥
টঙ্কারের ব্যেধ বলে আমি যারে ধরি। ধনুকের মত তারে টান দিয়ে মারি ॥
এতেক বলিয়া সবে শূন্যভরে যায়। ধুতুরার মাঠে গিয়ে উপনীত হয় ॥
সেইখানে জানকীরে দেখিবারে পায়। খেলাড়ুর সঙ্গে একমনেতে খেলায় ॥
শূন্যভরে সবে তার চেপে ধরে পাটি। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে কুটি কুটি ॥
সঙ্গের খেলাড়ু যত দেখিবারে পায়। কি হল কি হল বলে বাড়ি লয়ে যায় ॥
মায়ের কাছেতে গিয়ে কাঁদিতে লাগিল। রক্ত মুখে দেখে বাছায় কোলে তুলে নিল ॥
মা মা বলে খালি পুত্র কাঁদে উভরায়। বলে জল খেতে দে মা আমার প্রাণ বাহিরায় ॥
ত্বরা করে দাসী তখন জল এনে দেয়। জল খেয়ে রাজপুত্র ধীরে ধীরে কয় ॥
শুন শুন ওগো মাতা বলি যে তোমারে। এ জন্মের মত বিদায় দাও গো আমারে ॥
এতেক শুনিয়া রাণী বলে হায় হায়। ও কথা বোল না বাবা বক্ষ ফেটে যায় ॥
রাণী বলে ওগো দাসী আমার কথা শুন। সভা হতে শীঘ্র মহারাজে ডেকে আন ॥
রাজসভায় গিয়ে দাসী সব কহিতে লাগিল। শশব্যস্তে রাজা তখন অন্তঃপুরে গেল ॥
অন্তঃপুরে ঢুকে রাজা পুত্র পানে চায়। রক্ত উঠে পুত্রের মুখে দেখিবারে পায় ॥
বলে কি ঘটলো অদৃষ্টে আমার বিধি হল বাম। অকালেতে বুঝি আমি পুত্র হারালাম ॥
রাণী বলে এখন রাজা কি হবে উপায়। পুত্রের এ দশা দেখে আমার বক্ষ ফেটে যায় ॥
রাজা বলে ওগো রাণী আমার কথা নাও। পালঙ্ক উপরে পুত্রে শোয়াইয়া দাও ॥
পালঙ্ক উপরে তখন শোয়াইয়া দিল। শুইয়ে সেখানে পুত্র চৈতন্য হারাল ॥
রাণী কেঁদে বলে রাজা শুন বলি আমি। জনমের মত আজ হইনু দুখিনী ॥
রাজা বলে কি সর্ব্বনাশ হইল এখন। এত বলি লাগিলেক করিতে ক্রন্দন ॥
পুত্রশোকে রাজারাণী কাঁদে উভরায়। হা পুত্র হা পুত্র বলে ধূলাতে লোটায় ॥
বলে হায় রে দারুণ বিধি কি কহিব আর। দিয়ে পুত্র হরে নিলি এ কি অবিচার ॥
পুত্রশোকের যাতনা সহা নাহি যায়। পুত্রশোকে এ জীবন ছাড়িব নিশ্চয় ॥
এত দুঃখ রায়মণি বুঝিয়ে অন্তরে। সন্ন্যাসীর বেশ ধরে যায় ধীরে ধীরে ॥
সন্ন্যাসীর বেশে তখন বাবা পঞ্চানন। রাজার বাড়িতে গিয়ে দিল দরশন ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল। মৃত পুত্রে রায়মণি কোলে তুলে নিল ॥
সঞ্জীবনী মন্ত্রে তার প্রাণ সঞ্চারিল। পুত্রে বাঁচাইয়া দেব অন্তর্হিত হইল ॥
পুত্র পেয়ে রাজা রাণীর দুঃখ দূরে গেল। ষোড়শ উপচারে পূজা আরম্ভ করিল ॥

[১] পুড়ো অর্থাৎ পুড় (ধান্য রাখিবার খড়ের আধার)।

পূজা দেখি রায়মণি হন ঘটে অধিষ্ঠান। কৃপা করে স্বপ্ন দিয়ে রাজারে জানান॥
শঙ্খ চন্দন ঝারা বারা নাহি তোমার ঘরে। ত্বরা করে যাও তুমি দক্ষিণ সফরে॥
এতেক জানিয়া রাজা নগর মধ্যে যায়। ডাকিয়া আনয়ে এক সাধুর তনয়॥
বলে শুন সাধুর পুত্র জানাই তোমারে। চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে যাও দক্ষিণ সফরে॥
শঙ্খ চন্দন ঝারা বারা ঘট বারি আন। ষোড়শ উপচারে পূজার আয়োজন জান॥
এত শুনি সাধুর পুত্র করিল গমন। বোহিত্রের[১] কাণ্ডারী যত ডাকিল তখন॥
বোহিত্রের কাণ্ডারী সবে ডিঙ্গা সজ্জা করি। সাধুর নন্দনে লয়ে ভাসাইল তরী॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে যায় সাধুর তনয়। হেদোদহে আসি ক্রমে উপনীত হয়॥
হেদোদহ এড়াইয়ে কাঁকড়াদহে গেল। কাঁকড়াদহ ছেড়ে পক্ষীদহেতে পৌছিল॥
পক্ষীদহে পক্ষী দেখে সবার উপজিল ভয়। ডিঙ্গা গিলিবারে তারা মুখ মেলে ধায়॥
ডিঙ্গার উপরে বাদ্য বাজাতে লাগিল। শব্দ শুনে পক্ষী সব পলাইয়া গেল॥
বাহ বাহ বোলে ডাকে বোহিত্রের কাণ্ডারী। বাহিয়া সবে চৌদ্দ ডিঙ্গা যায় ত্বরা করি॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে তখন মায়াদহে যায়। মায়াদহে আশ্চর্য্য এক দেখিবারে পায়॥
নদীর ভিতরে দীপ দেখিতে পাইল। আচম্বিতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল॥
দেখি সদাগর মনে ভাবিল তখন। নদীর ভিতরে দীপ জ্বলে কি কারণ॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র তরি বেয়ে যায়। রাজার ঘাটেতে গিয়ে উপনীত হয়॥
রাজার ঘাটেতে উঠে দামা বাজাইল। শব্দ শুনে রাজার কোটাল দেখিতে আসিল॥
কোটাল তাহারে তখন সঙ্গে লয়ে যায়। রাজার কাছেতে শীঘ্র উপনীত হয়॥
সভার মাঝে বসে রাজা সিংহাসন উপরে। প্রণাম করে সাধুর পুত্র কহিল রাজারে॥
শুন শুন বীরবর কহি তব ঠাঁই। এমন আশ্চয্য আমি কভু দেখি নাই॥
মায়াদহে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কি কারণ। সেথা নদীমধ্যে দীপ জ্বলে শুন বিবরণ॥
রাজা কহে শুন বলি সাধুর নন্দন। দেখাইতে পারিবে কি বল না এখন॥
সত্য যদি হয় অর্দ্ধরাজ্য কন্যা দিব। আর দেখাইতে না পারিলে মশানে বধিব॥
এতেক বলিয়া তবে সত্য করাইল। কোটালের সঙ্গে তারে পাঠাইয়া দিল॥
মায়াদহে গিয়ে সবে উপনীত হল। না শুনিল শঙ্খরব দীপ না দেখিল॥
কোটাল কহিল বেটা মোর কথা শোন। কোথা শঙ্খরব দীপ দেখা না এখন॥
রাজার নিকটে কেন মিথ্যা কহিলে। এখনি বধিব তোরে মশানে লইলে॥
কুপিয়া কোটাল তখন গালে চড় মারে। কাড়িয়ে লইয়ে পাগড়ী তোলে টিকি ধরে॥
কেহ কিল মুঠি মারে ঘাড় নোয়াইয়ে। পিঠমোড়া করে তারে ফেলিল বাঁধিয়ে॥
সাধুর পুত্র বলে কোটাল না মারিও মোরে। আমারে লইয়া চল রাজার গোচরে॥
বিচার করিয়ে ভাই যা করে নৃপতি। খণ্ডন করিতে পারে কাহার শকতি॥
শুনিয়ে না শুনে তারা আপনার বলে। ঢেকা ঢোকা দিয়ে তারে রাখে মধ্যস্থলে॥

[১] বোহিত্র অর্থাৎ নৌকা।

চলিল কোটাল তবে সাধুরে লইয়া। আগুপাছু যায় সৈন্য চৌদিকে বেড়িয়া॥
রাজসন্নিধানে সবে আসি কুতূহলে। প্রণমিয়ে বীরভদ্র নৃপতিরে বলে॥
অবধান মহারাজ শুন সমুদয়। যা কয়েছিল সাধুর পুত্র কিছু সত্য নয়॥
ইহা বুঝে আজ্ঞা কর দণ্ডের ঈশ্বর। এখন কি হবে তাহা বল নৃপবর॥
মহাকোপে রাজা কহে শুন ভদ্রবর। মশানে লইয়ে ওরে বধহ সত্বর॥
নৃপতির কোপ হৃদে জানিয়া কোটাল। মশানে লইল ধরে সাধুর ছাওয়াল[১]॥
সাধুর পুত্র করজোড়ে কাঁদিয়া বলিল। মশানে মরণ শেষে বিধাতা লিখিল॥
কাতর হইয়ে তখন সাধুর নন্দন। বলে স্নান করে শুচি হয়ে আসিব এখন॥
ইহা শুনে কোটাল তাহারে ছেড়ে দিল। গঙ্গাজলে ডুবিয়ে সে শুচি হয়ে এল॥
শুচি হয়ে একমনে করয়ে স্তবন। ভক্তিভরে স্মরি হৃদে দেব পঞ্চানন॥
বলে দক্ষিণ সফরে এসে হইলে মরণ। না হবে তোমার প্রভু পূজা প্রচারণ॥
দয়া করে ক্ষিতিপরে উলিয়ে[২] সত্বরে। এ ঘোর বিপদে বাবা রক্ষা কর মোরে॥
তোমার চরণ বিনে আর নাহি ফল। গোঁসায় বাঁধিয়া ফেল যত সৈন্যদল॥
ঘনায়ে ঘিরিয়া আসে দেখি মহাঘোর। এ মহা বিপদে বাবা শোন বাণী মোর॥
দক্ষিণ সফরে বাবা আমারে পাঠালে। নিদয় পাযাণ হয়ে কেন ভুলে গেলে॥
কোটালের কিল মুষ্টি অসহ্য এখন। দয়া করে দেখা দাও দেব পঞ্চানন॥
এত বলি সাধু যবে কাঁদিতে লাগিল। আচম্বিতে রায়মণির আসন টলিল॥
জরাসুর পাত্র ডেকে রায়মণি বলে। আচম্বিতে আজ আমার আসন কেন টলে॥
জরাসুর পাত্র শুনে এই কথা বলে। দক্ষিণ সফরে সাধুর পুত্ররে পাঠালে॥
মায়াদহে যে মায়া তুমি করিলে তখন। দেখাইতে না পারিল সাধুর নন্দন॥
গোঁসা করি রাজা তখন দিল অনুমতি। দক্ষিণ মশানে তারে কাট শীঘ্রগতি॥
এত শুনি রায়মণি ক্রোধে কম্পবান। ব্যেধগণ লয়ে সঙ্গে বেগে চলে যান॥
দক্ষিণ মশানে গিয়ে উপনীত হন। সাধুর নন্দনে নিজ কোলে তুলে লন॥
ক্রোধভরে রায়মণি সব ব্যেধে ভেজাইল[৩]। মার মার বলে তারা নাচিতে লাগিল
মহারঙ্গে নাচে তারা হয়ে উতরোল। পালাতে না পারে সৈন্য হইয়ে বিভোল॥
চারিদিকে ব্যেধগণ নাচে ঝম্ ঝম্। একে একে সৈন্য যত করিল নিধন॥
তার মধ্যে কোটাল বেটা পালাইয়ে গেল। রাজার কাছেতে গিয়ে উপনীত হল॥
প্রণাম করিয়ে ভয়ে রাজারে কহিল। মশান মাঝে এক বুড়া কোথা হতে এল॥
বিকট আকার তার উর্দ্ধপরিসর। ব্যেধগণ সঙ্গে লয়ে অতি ভয়ঙ্কর॥
মহাযুদ্ধ হল রাজা মশানের ভিতর। একে একে সৈন্য সব করিল সংহার॥
কোটালের মুখে শুনে এতেক কাহিনী। চলিলেক রাজা মনে মহাভয় গণি॥
মশানের মাঝে গিয়ে উপনীত হল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক দেখিতে পাইল॥

১। ছাওয়াল অর্থাৎ পুত্র। ২। উলিয়ে অর্থাৎ নামিয়ে। ৩। ভেজাইল অর্থাৎ নিযুক্ত করিল।

ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা প্রণাম জানায়। বলে কে তুমি ঠাকুর মোরে দেহ পরিচয় ॥
রূপসেন রাজা আমি তোমায় চিনিতে না পারি। পরিচয় দেহ বাবা মোরে দয়া করি ॥
এতেক শুনিয়ে দেব করিলেন উত্তর। পঞ্চানন্দ নাম মোর জানে চরাচর ॥
দক্ষিণ সফরে পাঠাই সাধুর নন্দন। শঙ্খ চন্দন লাগি মোর পূজার কারণ ॥
ঘটবারি ঝারা বারা দাও তো এখন। তা হলে বাঁচায়ে দেব তব সৈন্যগণ ॥
এত শুনি রাজা ভয়ে স্বীকার হইল। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে সব সৈন্য বাঁচাইল ॥
রাম রাম বলি সৈন্য সকলে উঠিল। রায়মণি আচম্বিতে অন্তর্দ্ধান হইল ॥
দ্বিজ রামানন্দ কয় রায়পদ স্মরি। মশান সমাপ্ত হল বল হরি হরি ॥

রাজা বলে শুন বাছা সাধুর নন্দন। ঘটবারি ঝারাবারা লও তো এখন ॥
শঙ্খ চন্দনাদি সব ডিঙ্গায় তুলে দিল। দেখিয়া সাধুর পুত্র হরষিত হল ॥
রাজা বলে সাধুর পুত্র শুন দিয়া মন। চৌদ্দ ডিঙ্গা হইল ভরা শুন বিবরণ ॥
শুনি হরষিত হল সাধুর নন্দন। রাজার নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥
ওগো রাজা মহাশয় করি নিবেদন। চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে আমি যাইব এখন ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে তখন দেশে চলে যায়। রাজার নিকটে সাধু মাগিয়া বিদায় ॥
হাতে দাঁড় কেরোয়াল সব বসিল গাবর। বাহ বাহ বলে হাঁকে সাধু সদাগর ॥
আনন্দেতে চলে তবে আপন ভবন। ভক্তিভরে প্রণমিয়া দেব পঞ্চানন ॥
দিবস রজনী সবে ডিঙ্গা বেয়ে যায়। পঞ্চানন্দের পাদপদ্মে রামানন্দ গায় ॥

সাধুর নন্দন আনন্দিত অতি। আপন দেশেতে করিলেক গতি ॥
যার যেইখানে কাণ্ডারী বইসে। বোহিত্র লইয়া চলিল দেশে ॥
বাহ বাহ বাহ কাণ্ডারী বলে। কলিঙ্গ দোহাত বাহিয়া চলে ॥
কলিঙ্গ দোহাত পশ্চাত করি। মায়াদেহে আসি চাপায়ে তরি ॥
স্নানদান করে সাধু সেথায়। প্রণাম করিলেক পঞ্চানন্দের পায় ॥
রন্ধন ভোজন করিয়ে সুখে। ডিঙ্গা খুলে দিলে জুয়ার[১] মুখে ॥
দিবস রজনী বাহিয়ে যায়। দ্বিজ রামানন্দ আনন্দে গায় ॥

বাহ বাহ বলে ডাকে সাধু গুণমণি। চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে যায় দিয়ে জয়ধ্বনি ॥
দিবস রজনী সাধু ডিঙ্গা বেয়ে যায়। পক্ষীদহে এসে পুনঃ উপনীত হয় ॥
পক্ষীদহে চৌদ্দ ডিঙ্গা আসিলে সত্বরে। বড় বড় পক্ষী উড়ে ডিঙ্গা ছুইবারে ॥
দেখি সদাগর তখন ভাবে মনে মনে। এবারেও রক্ষা করবেন দেব পঞ্চাননে ॥
তখন বুদ্ধিমন্ত কর্ণধারে বুদ্ধি উপজিল। কাণ্ডারবহর প্রতি কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন বলি ভাই কাণ্ডার বহর। নানা বাদ্য কর সবে ডিঙ্গার উপর ॥
এত শুনি কাণ্ডারেরা হরষিত মন। নানা বাদ্য বাজাইতে লাগিল তখন ॥

১। জুয়ার অর্থাৎ জোয়ার

বাদ্যশব্দে পক্ষী সব পালাইয়া গেল। দেখি সদাগর ভারি হরষিত হল ॥
আনন্দিত মনে দেশে ফিরিল তখন। চৌদ্দ ডিঙ্গা মাঝে করে পূজার আয়োজন ॥
দিবস রজনী সাধু ডিঙ্গা বেয়ে যায়। হেদো দহের ঘাটে গিয়ে উপনীত হয় ॥
সেথা হতে ছাড়ি ডিঙ্গা পবনবেগে চলে। কাণ্ডারেরা আনন্দেতে হরি হরি বলে ॥
পদ্মমালার ঘাটে এসে ডিঙ্গা চাপাইল। একে একে সকল ডিঙ্গা নঙ্গর করিল ॥
নঙ্গর করিয়া সবে উঠিলেক কূলে। রন্ধন ভোজন কৈল মহাকুতূহলে ॥
রন্ধন ভোজন করে সাধুর নন্দন। রাজার সভাতে গিয়ে দিলে দরশন ॥
সভা করে নরপতি বসে আছে রঙ্গে। পাত্র মিত্র পুরোহিত প্রজাগণ সঙ্গে ॥
যেই মাত্র নরপতি সাধুরে দেখিল। আকাশের চাঁদ যেন হাতেতে পাইল ॥
রাম বলি কোলাকুলি কৈল দুই জন। করে ধরি সদাগরে বসালে তখন ॥
রাজা বলে শুন বাছা সাধুর নন্দন। এতেক বিলম্ব কেন কহ বিবরণ ॥
করে ধরি সদাগর কহিল তখন। রাজা শুনিয়া তাহার কথা হরষিত হন ॥
রাজা কহে শুন বলি সাধুর কুমার। তোমা প্রতি পঞ্চানন্দের করুণা অপার ॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দে মগন। নানা উপচারে করে পূজার আয়োজন ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত সকলে ডাকিল। দিকে দিকে পঞ্চানন্দের পূজা আরম্ভিল ॥
বোধ সঙ্গে বোধপতি আনন্দিত মন। পদ্মমালে গ্রামে আসি রহেন তখন ॥
সে সময় মহারাজ সদা করে স্তব স্তুতি। সদয় হইল রায় জগতের গতি ॥
ঘটেতে আসিয়া উর দেব পঞ্চানন। আজি হতে তব পূজা হল প্রচারণ ॥
নানাভাবে স্তব রাজা তখন করিল। পদ্মমালা গ্রামে পূজা প্রকাশ হইল ॥
সেই দিন হতে সবে পূজে জনে জন। এইরূপে হয় দেবের পূজা প্রচারণ ॥
পঞ্চানন্দের পাদপদ্মে মজাইয়া চিত। অষ্টমঙ্গলের গীত[১] হইল বিদিত ॥

অষ্টমঙ্গল গীত

অষ্টমঙ্গলের গীত শুন সর্ব্বজন। যেরূপে হইল দেবের সৃষ্টির কারণ ॥
নিরাকার ছিল যবে এ তিন ভুবন। আপনি করিল ধর্ম্ম সৃষ্টির পালন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপন শরীরে। নির্গত করিল তবে ঈশ্বরের বরে ॥
দেখিলেন সুখী হয়ে ধর্ম্ম নিরঞ্জন। বাম অঙ্গে প্রকৃতি জন্মিলা তিন জন ॥
বিষ্ণুর হইল লক্ষ্মী ব্রহ্মার সাবিত্রী। শিবের হইল দুর্গা জগতের মাত্রী ॥
রবি শশী হুতাশন দেবগণ যত। জন্মিলেন ক্রমে ক্রমে তাহা কব কত ॥
প্রণাম করিয়া ঘটে দাও পুষ্পাঞ্জল। বিধিমতে পাবে অষ্টমঙ্গলের ফল ॥

১। কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন কালে মানবগণের মঙ্গলের জন্য এই শ্রেণীর গাথাগুলি আট দিন ব্যাপিয়া গীত হইত। সে কারণ, লোকে ঐ সকল গাথাকে অষ্টমঙ্গলের গান বলিত। আবার কেহ কেহ বলেন, ঐ সকল গান এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া অষ্টম দিবসে পরবর্তী মঙ্গলবারে শেষ হইত বলিয়া উক্তরূপ নামে অভিহিত হয়।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের অবদান নির্ণয় করতে গেলে অক্ষয়কুমারের পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার করতে হয়। অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই হিসাবে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দকে পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানসাহিত্যের সীমারেখা ধরা চলে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন ইউরোপীয়েরা। গোড়ার দিক্‌কার প্রায় সবগুলো বিজ্ঞানগ্রন্থই ইউরোপীয়দের লেখা। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বাংলা অঙ্কবই সে-গণিতের (প্রঃ প্রঃ ১৮১৭ খৃঃ) লেখক রবার্ট মে ইউরোপীয়। বাংলা ভাষায় প্রথম অস্থি ও শরীরবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যাহারাবলীর (প্রঃ প্রঃ ১৮২০ খৃঃ) লেখক ফেলিক্‌স্ কেরী এবং প্রথম রসায়নবিজ্ঞান কিমিয়াবিদ্যাসারের (প্রঃ প্রঃ ১৮৩৪ খৃঃ) লেখক জন ম্যাকও ইউরোপীয়। ইহা ছাড়াও পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্ত (প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খৃঃ), মার্শম্যানের জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৯ খৃঃ), হার্লের গণিতাঙ্ক (প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খৃঃ), লোশনের পশ্বাবলী (প্রথম সংখ্যা, প্রঃ প্রঃ ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে[১]), পিয়ার্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ), ইয়েট্‌স্-এর পদার্থবিদ্যাসার (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ) এবং জ্যোতির্বিদ্যা (প্রঃ প্রঃ ১৮৩৩ খৃঃ) প্রভৃতি পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। এদেশীয়দের রচিত প্রথম অঙ্কবই হলধর সেনের বাঙ্গলা অঙ্কপুস্তক (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল) একটি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। শিশু-সেবধি গণিতাঙ্ক, ১ম ভাগ (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল) সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন রায়। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় একটি ভূগোল লেখেন। গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছিল 'জ্যাগ্রাফী'। ইহা ছাড়া তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি বই (খগোল) ও একটি জ্যামিতিও লিখেছিলেন।[২] উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় না। ভূগোল গ্রন্থটি সম্বন্ধে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে পঠিত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ইংরেজী ও বাংলায় লেখা রামমোহন রায়ের ভূগোল রচনার কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ছাপাবার উদ্দেশ্যে কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছে। এ দেশে

১। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে গ্রন্থটির প্রশংসা করা হয়। তৃতীয় রিপোর্ট পাঠ করা হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর।

২। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (পঞ্চম সংস্করণ), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪০৭। প্রথম সংস্করণেও (১২৮৭) নগেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থগুলোর কথা বলেছেন এবং কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেছেন।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাও উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত দেবের শিশুপাঠ্য বই বাঙ্গলা শিক্ষাগ্রন্থেও (প্রঃ প্রঃ ১৮২১ খৃঃ) ভূগোল ও গণিতবিষয়ক প্রসঙ্গ কিছু কিছু রয়েছে। তবে তা' একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানতঃ ইউরোপীয়েরাই। কিন্তু ইউরোপীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র ইয়েট্‌স্ ছাড়া প্রায় সকলের ভাষাই ছিল কৃত্রিম ও দুর্ব্বোধ্য। উদাহরণ স্বরূপ ফেলিক্‌স্ কেরী ও ম্যাকের দুর্ব্বোধ্য ভাষার কথা বলা চলে। অক্ষয়কুমার দত্তই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে সুন্দরভাবে দেশীয় সাজে সজ্জিত করলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী, যিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ভূগোল। তত্ত্ববোধিনী সভার অনুমতি-ক্রমে ১৭৬৩ শকাব্দে (১৮৪১ খৃঃ) এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছিল ক্লিফটের ভূগোলসূত্র, হেমিলটনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেট, মিচেলের ভূগোল প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থ থেকে। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ, গোলতা, জলস্থানের বিবরণ, বিভিন্ন মহাদেশের প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ এবং অধিবাসীদের ধর্ম্ম ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত শিশুসেবধি (প্রঃ প্রঃ ১২৪৭ সাল) নামক গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে এই প্রয়াস আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত। ইহা ছাড়া শিশুসেবধির তুলনায় তার রচনা অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ। পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্তে এরূপ সামগ্রিক আলোচনার কোনো প্রয়াস নেই। পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষে এর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল মাত্র। তবে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান ত্রুটি স্বল্পপরিসরের মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশ। ফলে রচনা কোন কোন স্থানে তথ্য-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। রচনার নিদর্শন :—

"জলের বিবরণ—মহাসাগর পঞ্চ অংশে বিভক্ত যথা আটলাণ্টিক মহাসাগর, হিন্দী মহাসাগর, এবং উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্বসীমা ইউরোপ এবং পশ্চিম সীমা আমেরিকা। তাহার পরিমাণ প্রায় ৪২৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০০ হইতে ২৫০০ ক্রোশ প্রস্থ।

পাসিফিক মহাসাগরের পশ্চিম সীমা আসিয়া এবং পূর্ব্ব সীমা আমেরিকা। তাহার পরিমাণ প্রায় ৫৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৩৫০০ ক্রোশ প্রস্থ।

হিন্দী মহাসাগরের পশ্চিম সীমা আফ্রিকা, পূর্ব্বসীমা নব হলণ্ড, উত্তরসীমা ভারতবর্ষ, দক্ষিণসীমা দক্ষিণ মহাসাগর। তাহার পরিমাণ ২৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২০০০ ক্রোশ প্রস্থ।

উত্তর মহাসাগরের উত্তর সীমা উত্তর কেন্দ্র, দক্ষিণ সীমা উত্তর কেন্দ্রায় মণ্ডল।

দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ কেন্দ্র, উত্তর সীমা উত্তমাশা অন্তরীপ, হর্ণ অন্তরীপ এবং নব জীলণ্ডের উত্তর অংশ।"

অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থটিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Pure Science) বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা যায় না, তবে এর স্থানে স্থানে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রয়েছে। এই গ্রন্থ রচনার মূলে ছিল ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের পাণ্ডিত্য এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্য দিয়ে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা। গ্রন্থটি দু'ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাব্দের পৌষ মাসে (১৮৫১ খৃঃ); আর দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশকাল মাঘ, ১৭৭৪ শকাব্দ (১৮৫৩ খৃঃ)। ১৭৭০ শকাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। জর্জ্জ কুম্বের 'Constitution of Man' অবলম্বনে এই বইটি লেখা। কুম্ব তাঁর গ্রন্থে প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে বোঝাতে চেয়েছেন, কি ভাবে জীবন যাপন করলে উপকার হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে কি কি অপকার হয়। অক্ষয়কুমার কুম্বের এই চিন্তাধারাটি অনুসরণ করেছেন; তাঁর গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ করেন নি।[৩] অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন এদেশীয় জনসাধারণের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু তৎকালীন বাঙ্গালী যুবকসম্প্রদায়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারকে' বিজ্ঞানবিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা না গেলেও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এর স্থানে স্থানে রয়েছে। অল্প কথায় ও প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় বোঝাবার চেষ্টা সেখানে সুস্পষ্ট। যেমন,

"মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, মানবদেহও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য বেলুন যন্ত্র সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া, লোকে জ্ঞান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুতঃ আকর্ষণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ইহা ঐ আকর্ষণ শক্তিরই কার্য্য। যেমন শোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে; সেইরূপ বেলুনযন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদয় বেলুন তাহার আয়তন প্রমাণ বায়ুরাশি অপেক্ষা লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। অতএব এ স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না।"

৩। বাহ্য বস্তুর……বিচার। বিজ্ঞাপন। (কুম্বের গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। কুম্বের গ্রন্থ সম্বন্ধে তথ্যাদি অক্ষয়কুমার-লিখিত ভূমিকা থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে।)

সরল ও সরস বালকপাঠ্য রচনার মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তুললেন। চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোই এর নিদর্শন। চারুপাঠে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি তিন ভাগে প্রকাশিত হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৭৫ শক (১৮৫৩ খৃঃ), ১৭৭৬ শক (১৮৫৪ খৃঃ) ও ১৭৮১ শক (১৮৫৯ খৃঃ)। চারুপাঠের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। গ্রন্থটির তিনটি ভাগই কয়েকটি করে পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উপদেশ ও নীতিকথামূলক প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে। এ ভাবে রচনা-সন্নিবেশের কারণ সম্পর্কে লেখক প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, "এক বিষয়ের অনেক প্রস্তাব উপর্য্যুপরি অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশ বোধ হয়, এ নিমিত্ত প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্থাপিত হইয়াছে।" তিন ভাগ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার সংখ্যাই চারুপাঠে অধিক। চারুপাঠে প্রাণী ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রচনা রয়েছে। প্রাণি-বিজ্ঞানবিষয়ক রচনারই প্রাধান্য। চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোতে অক্ষয়কুমার তথ্যসন্নিবেশ অপেক্ষা রচনাকে মনোরম করে তোলবার দিকেই বেশী জোর দিয়েছেন। তথ্যসমাবেশের দিক্ থেকে বিচার করলে অনেক প্রবন্ধই দুর্ব্বল, সন্দেহ নেই; কিন্তু সরল ভাষা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী অধিকাংশ রচনাকে গল্পের মত সুখপাঠ্য ক'রে তুলেছে। এখানেই চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য। রচনার নিদর্শন:—পুরুভুজ প্রাণী সম্পর্কে আলোচনার একাংশ:—

> "এই অসাধারণ জন্তুকে দুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে মস্তক থাকে তাহা হইতে এক নতুন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং যে খণ্ডে পুচ্ছ থাকে তাহা হইতে এক নতুন মস্তক উৎপন্ন হয়। এইরূপে উভয় খণ্ডের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া এক এক খণ্ড এক একটি জন্তু হইয়া উঠে। অন্যান্য জন্তুর সন্তানোৎপাদনের রীতি যে প্রকার, পুরুভুজের সে প্রকার নহে। তাহার সন্তানেরা প্রথমে তাহার শরীরোপরি ব্রণের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বৰ্দ্ধিত হয়, এবং ন্যূনাধিক দুই দিবসে সম্পূর্ণ সমুদায় অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র হইতে স্খলিত ও পতিত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ঐ দ্বিতীয় পুরুভুজ উক্ত প্রকারে পতিত হইবার পূর্ব্বেই উহার শরীরে আর একটা পুরুভুজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপে চারি পুরুষ পরস্পর একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে।"

অক্ষয়কুমারের সর্ব্বশেষ বিজ্ঞানগ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা' ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে পদার্থবিজ্ঞান লিখিবার প্রয়াস এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল। তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনস্থ পাঠশালার জন্য একখানি পদার্থবিজ্ঞান লেখা হয়েছিল। এ গ্রন্থখানি তারই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।[৪] ইতিপূর্ব্বে পদার্থবিদ্যাসার নাম দিয়ে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ দু'টি হল—ইয়েট্‌স্‌এর 'পদার্থবিদ্যাসার' (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ)

৪। অক্ষয়চরিত—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। পৃ. ৩২।

এবং পূর্ণচন্দ্র মিত্রের 'পদার্থবিদ্যাসারঃ' (প্রঃ প্রঃ ১৮৪৭ খৃঃ)। কিন্তু এদের কোনটিকেই ঠিক পদার্থবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ বলা যায় না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ (জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ ও ভূগোলবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি) উভয় গ্রন্থেরই আলোচ্য বিষয়। পদার্থবিদ্যা নিয়ে বাংলায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করলেন অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমারের পদার্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হোল জড় ও জড়ের গুণ (Matter and its general properties)। পদার্থবিজ্ঞানের এই একটিমাত্র বিভাগ নিয়ে আলোচনা করলেও পদার্থবিদ্যার এই প্রথম ও প্রধান বিভাগটি আলোচনার জন্যে বেছে নিয়ে অক্ষয়কুমার সুযুক্তি ও দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ, পূর্ব্বে ঠিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে সুপরিকল্পিত-ভাবে কোনো গ্রন্থই বঙ্গসাহিত্যে রচিত হয়নি। অবশ্য, ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামপুরনিবাসী হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ এবং শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরীণ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ডেস্ কোর্স (Day's Course) নামে একটি পুস্তকমালা প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন। কালিদাস মৈত্র-লিখিত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫) এবং 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ' (১৮৫৫) এই সিরিজের গ্রন্থ। এ ছাড়া এ সিরিজের আর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। এই দুটি গ্রন্থে পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল বিষয় অপেক্ষা ব্যাবহারিক দিকের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। অক্ষয়কুমার পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য জড় ও জড়ের গুণ নিয়ে আলোচনা ক'রে বঙ্গসাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ নিয়ে আলোচনার উৎসমুখও খুলে দিয়েছিলেন। পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হয়েছিল।[৫] এ গ্রন্থটির অধিকাংশই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৬]

পদার্থবিদ্যায় অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর বাংলা নাম ব্যবহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছে। পরবর্ত্তী পদার্থবিজ্ঞান-লেখকগণ বহু ক্ষেত্রেই বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেছেনে। যেমন Electricity-র বাংলা অক্ষয়কুমার করলেন তাড়িত। পরবর্ত্তী পদার্থবিজ্ঞান-লেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যোগেশচন্দ্র রায় ও সূর্য্যকুমার অধিকারী এই তাড়িত শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। Inertia-র বাংলা অক্ষয়কুমার লিখলেন জড়ত্ব। মহেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র ও সূর্য্যকুমারও Inertia অর্থে জড়ত্ব শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলো বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে এঁদের মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। যেমন Non-Conductor—অপরিচালক ; Ductility—তান্তবতা , Degree—তাপাংশ ; Thermometer—তাপমান ; Centre of gravity—ভারকেন্দ্র। অবশ্য সূর্য্যকুমার অধিকারী অক্ষয়কুমার অপেক্ষা মহেন্দ্রনাথকেই বেশী অনুসরণ করেছিলেন।

পদার্থবিদ্যায় পরমাণু ও জড়ের বিভিন্ন ধর্ম্ম নিয়ে মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনা করা

৫। পদার্থবিদ্যা—অক্ষয়কুমার দত্ত, বিজ্ঞাপন। ৬। ১৭৭৬ শকাব্দের আষাঢ় (৯৫ সংখ্যা) থেকে।

হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—প্রথম ভাগের পরিকল্পনার সঙ্গে এর কিছুটা মিল দেখা যায়। তবে ভূদেবের রচনা অক্ষয়কুমারের তুলনায় টেকনিক্যাল। রচনাভঙ্গীও অক্ষয়কুমারেরই বেশী সরল। গতি ও বেগ সম্বন্ধে আলোচনা ভূদেববাবুর গ্রন্থেই বিস্তৃততর। পদার্থবিদ্যায় বিস্তৃততর ও সূক্ষ্ম আলোচনা না থাকলেও অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য বিষয় বোঝাবার ফলে রচনার উৎকর্ষ বেড়েছে। তা ছাড়া এই গ্রন্থটির বিভিন্ন জায়গায় যে সব তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে, বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার জন্যে তা উল্লেখযোগ্য। যেমন, যোগকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের তুলনামূলক আলোচনা অথবা বিভিন্ন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক আলোচনা। এইরূপে অক্ষয়কুমার বাহ্য বস্তুর…বিচার ও চারুপাঠের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে সরস ও জনপ্রিয় করে তুললেন, অপর দিকে তেমনি ভূগোল ও পদার্থবিদ্যায় প্রাঞ্জল, সুপরিকল্পিত ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার পথ দেখালেন।

উপরোক্ত বইগুলি ছাড়া অক্ষয়কুমার একটি জ্যামিতি লিখেছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি।[৭] দৃষ্টিবিজ্ঞান, বারি-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়েও তাঁর গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা ছিল।[৮] কিন্তু একমাত্র বারি-বিজ্ঞান ও দৃষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা অক্ষয়কুমারের জীবনে মোটেই আকস্মিক নয়। বিজ্ঞানস্পৃহা শিশুকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। কৈশোরে পিয়ার্সনের ভূগোল তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল।[৯] ইংরেজী গ্রন্থের প্রতি তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি হবার মূলে এই ভূগোল ছিল বলে মনে হয়।[১০] গল্প উপন্যাস অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রতিই তাঁর টান ছিল বেশী। গণিত, শারীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এককালে অবসর সময়ে তিনি কবিতাও লিখতেন। তবে বিজ্ঞানের আকর্ষণ অক্ষয়কুমারের জীবনে গভীর ও ব্যাপক। এমন কি, তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক থাকাকালীনও তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়ে উদ্ভিদ ও রসায়নবিদ্যার ক্লাস করতেন।

সাময়িক পত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এই বিজ্ঞানানুরাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের বিরাট্ অবদান রয়েছে। তিনি বিদ্যাদর্শনের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। বিদ্যাদর্শন—এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিদ্যাদর্শনের প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছিল, তার একাংশে ছিল,…"যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানাপ্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা

৭। অক্ষয়কুমার দত্ত—অক্ষয়কুমার রায় প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৬।

৮। অক্ষয়চরিত—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পৃঃ ৬৩।

৯। ভারত শ্রমজীবী—বৈ ও জ্যৈঃ, ১২৯২; পৃঃ ৫০-৫২।

১০। নব্যভারত—১৩১৫, পৌষ—জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমার দত্ত।

যাইবেক।" বাংলা সাময়িক পত্রে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'বিদ্যাদর্শনে'ই প্রথম পাওয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত দিগদর্শন (প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৮১৮ খৃঃ), সমাচার দর্পণ (প্রঃ প্রঃ ২৩শে মে, ১৮১৮ খৃঃ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত বটে। কিন্তু এই সকল পত্রপত্রিকার বৈজ্ঞানিক রচনাগুলির তুলনায় বিদ্যাদর্শনের বৈজ্ঞানিক আলোচনাগুলি অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। বিদ্যাদর্শনে প্রাণিবিদ্যা, ভূ ও ভূগোলবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাদর্শন অল্পকালস্থায়ী হয়েছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাদর্শন দীর্ঘকালস্থায়ী না হবার কারণ, তখনও জনসাধারণের রুচি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। এ সম্পর্কে ১২৯২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকা'য় "অক্ষয়কুমার দত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল, "অক্ষয়বাবু উৎসাহের সহিত জ্ঞান বিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন।...টাকীর মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঘোষের সাহায্যে 'বিদ্যাদর্শন' নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। সর্ব্বপ্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে সময় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য লোক ছিল না। 'মহানবমী', 'রসরাজ' প্রভৃতি অশ্লীলতাপূর্ণ পত্রপত্রিকাই সেই সময়ে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইত। এখন সাধারণের বিজ্ঞানাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য যে ঘোর আগ্রহ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন সেরূপ ছিল না। বিদ্যাদর্শন ছয় মাস ব্যতীত জীবিত রহিল না।" বিদ্যাদর্শনের প্রথম প্রকাশকাল এবং ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশের তারিখ, উভয়ের মধ্যে কালের ব্যবধান ৪৩ বৎসর। ৪৩ বৎসরের মধ্যে বাংলার জনসাধারণের এই যে রুচির পরিবর্ত্তন, এর মূলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিরাট্ অবদান রয়েছে। যে পরিকল্পনা নিয়ে অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন পত্রিকার পরিচালনা আরম্ভ করেছিলেন, তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল তত্ত্ববোধিনীতে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ বার বৎসর ধরে অক্ষয়কুমার এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ২৫টি সংখ্যায় অবশ্য কোন বিজ্ঞানালোচনা নেই। ২৫ থেকে ৪৬ সংখ্যার মধ্যেও প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক প্রকৃতির আলোচনা ছাড়া উচ্চাঙ্গের কোন রচনা নেই। ৪৭ সংখ্যা (আষাঢ়, ১৭৬৯ শক) থেকেই তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক রচনাদি প্রকাশিত হতে লাগল। বস্তুতঃ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত। আর এই নবযুগের উদ্গাতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের বাহ্য বস্তুর...বিচার, পদার্থবিদ্যা, চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনীতেই সর্ব্বপ্রথম এক একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা দীর্ঘ দিন ধরে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হবার মর্য্যাদা পেল। এ ছাড়া তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হোল জ্যোতিব্বিদ্যা ও গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং ভূ ও ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি, প্রবন্ধগুলি

আকৃতিতেও হোল বিস্তৃততর। টেক্‌নিক্যালিটি বাদ দিয়ে সরল ও সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে রীতি তত্ত্ববোধিনীতে দেখা গেল, তা' সে যুগের ও পরবর্ত্তী যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও অনুসৃত হোল। তা ছাড়া সে যুগে বাংলাভাষার প্রতি জনসাধারণের অবজ্ঞা দূরীকরণে তত্ত্ববোধিনী সাহায্য করল।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের দান অপরিসীম। অসুস্থতার জন্যে অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা বন্ধ করলেন, তখন এই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা সাত শত থেকে দুই শতে এসে দাঁড়িয়েছিল। অতএব প্রথম বার বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাফল্য যে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত চেষ্টা-জন্য তা বোধ করি অস্বীকার করা চলে না। সে যুগের কোন কোন পত্রিকা অক্ষয়কুমারের নাম ভাঙ্গিয়ে পত্রিকার প্রচার বাড়াতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 'উপহার' পত্রিকার নাম করা যেতে পারে। "বঙ্গীয় লেখকচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত" এই পত্রিকায় লিখে থাকেন বলে উপহারের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গে ১২৮৯ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'প্রবাহে' মন্তব্য করা হয়, "বঙ্গীয় লেখকচূড়ামণি অক্ষয়কুমার দত্ত বলিলে 'বাহ্যবস্তু' 'চারুপাঠ' প্রভৃতি প্রণেতা অধুনা বালী-নিবাসী পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্তই লক্ষিত হন। কিন্তু আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে, উক্ত অক্ষয়বাবু উপহার নামক কোন সাময়িকপত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন; লিখিতে স্বীকৃত হওয়া ত দূরের কথা।"

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অক্ষকুমার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বলিষ্ঠতা ও প্রকাশক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্য রচনার প্রয়োজন—সংযত দৃষ্টিভঙ্গী, যথাযথ তথ্যসন্নিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষা। অক্ষয়কুমারের রচনায় এই তিনটি গুণই বিদ্যমান। ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা জন্মভূমিতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র কবিতা লিখেছিলেন,

"বিজ্ঞান-সাহিত্য শোভে তোমার লেখায়,
অক্ষয় অক্ষয় কীর্ত্তি পুণ্য বাঙ্গালায়।"

এই উক্তিকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, অক্ষয়কুমার শুধু উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-সাহিত্যই রচনা করেননি, বিজ্ঞানের তথ্য ও ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষারও সৃষ্টি করে গেছেন। অক্ষয়কুমারের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। তাঁর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—ভাষার বলিষ্ঠ বাঁধুনি ও সংযমবোধের সাহায্যে বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রধান রূপকার অক্ষয়কুমার বাংলা-বিজ্ঞানসাহিত্যের কাঠামোতেও একটি পরিণত রূপ দিয়ে গেছেন।

পরিষদে রক্ষিত নবগ্রহ-মূর্ত্তি

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণি সেন

সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহাদির প্রভাব দ্বারা জীব-জগতের কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এই বিশ্বাস সুদূর অতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত। বৈদিক যুগেও যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, শিল্পরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থে গ্রহাদির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণের মতে সূর্য্য বিশ্বের আদি সৃষ্টি বলিয়া আদিত্য নামে পরিচিত।[১] সূর্য্যের অপর নাম সবিতা কারণ আলোক প্রসব দ্বারা ইনি বিশ্বের তমঃ বা অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং ইহাঁকেই কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের সব কিছু সংঘটিত হইতেছে। অন্যান্য গ্রহগুলিও ইহাঁর প্রভাবে প্রভাবিত এবং এই গ্রহগুলির সমষ্টিগত প্রভাবের দ্বারা মনুষ্য বা জীবজাতির সুখ দুঃখ, কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রহের প্রভাব মঙ্গলকর ও কতকগুলি হানিকর এবং ইহাদের তুষ্টিবিধান করিতে পারিলে মানুষ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

প্রধানতঃ এই কারণ হইতেই আমাদের দেশে গ্রহগণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজার প্রচলন হয়। মৎস্যপুরাণ, শিল্পরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ সকল মূর্ত্তির নির্ম্মাণপদ্ধতি বর্ণিত আছে।[২] স্থানভেদে ঐ সকল মূর্ত্তির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। নবগ্রহের সহিত গণপতি বা বিনায়ক-পূজার বিধিও দেখা যায়।[৩] এই শ্রেণীর মূর্ত্তি বাঙ্গলা ও উড়িষ্যাতেই

১। তদন্তর্ভগবানেষ সূর্য্যঃ সমভবৎ পুরা।
আদিত্যশ্চাদিভূতত্বাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্ম পঠন্নভূৎ।
—মৎস্যপুরাণ, ২য় অঃ, ৩১।

২। পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎ সদা রবিঃ।১
শ্বেতঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ।
গদাপাণির্দ্বিবাহুশ্চ কর্ত্তব্যো বরদঃ শশী।২
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ শক্তিশূলগদাধরঃ।
চতুর্ভুজঃ শ্বেতরোমা বরদঃ স্যাৎ ধরাসুতঃ।৩
পীতমাল্যাম্বরধরঃ কর্ণিকারসমদ্যুতিঃ।
খড়্গচর্ম্মগদাপাণিঃ সিংহস্থো বরদো বুধঃ।৪
দেবদৈত্যগুরূ তদ্বৎ পীতশ্বেতৌ চতুর্ভুজৌ।
দণ্ডিনৌ বরদৌ কার্য্যৌ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলূ।৫
ইন্দ্রনীলদ্যুতিঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ।
বাণ-বাণাশনধরঃ কর্ত্তব্যোঽর্কসুতস্তথা।৬
করালবদনঃ খড়্গচর্ম্মশূলী বরপ্রদঃ।
নীলসিংহাসনস্থশ্চ রাহুরত্র প্রশস্যতে।৭
ধূম্রা দ্বিবাহবঃ সর্ব্বে গদিনো বিকৃতাননাঃ।
গৃধ্রাসনগতা নিত্যং কেতবঃ স্যুর্ব্বরপ্রদাঃ।৮
সর্ব্বে কিরীটিনঃ কার্য্যা গ্রহা লোকহিতাবহাঃ।
দ্ব্যঙ্গুলেনোচ্ছ্রিতাঃ সর্ব্বে শতমষ্টোত্তরং সদা।৯
—মৎস্যপুরাণ, ৯৪ অঃ।

৩। এবং বিনায়কঃ পূজ্যো গ্রহাশ্চৈব বিধানতঃ।
কর্ম্মণাং ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাম্।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ অঃ।
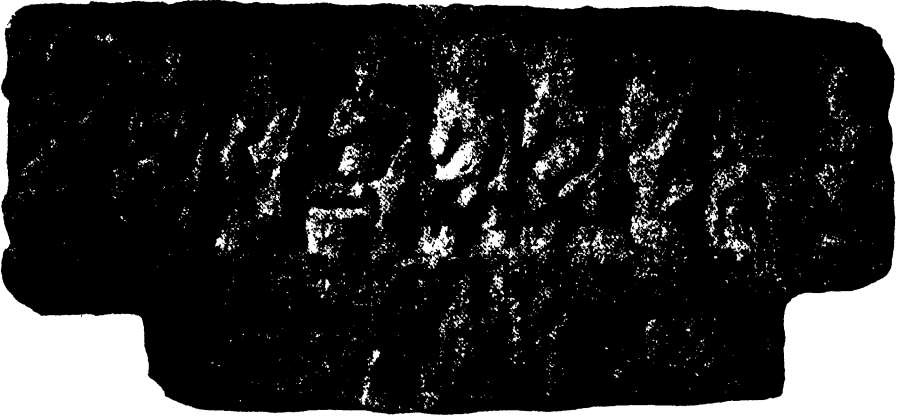
গজলক্ষ্মী মূর্তি-সহ উপবিষ্ট নবগ্রহের মূর্তি (আনুমানিক ১১শ শতাব্দী

বিনায়ক-সহ দণ্ডায়মান বাহনাদিযুক্ত নব গ্রহের মূর্তি (আনুমানিক ১২শ শতাব্দী

সচরাচর সুলভ। কোন কোন স্থলে নবগ্রহের সহিত লক্ষ্মীমূর্ত্তিও পূজিত হন। তবে সেইরূপ মূর্ত্তি সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় উক্ত উভয় প্রকারের দুইটি নবগ্রহমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

সূর্য্য গ্রহরাজ। সেই জন্য গ্রহমধ্যে তাঁহাকে অগ্রে স্থান দেওয়া হয়। আবার পৃথক্‌ভাবেও তাঁহার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যোপাসনা দ্বারা রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, ভবিষ্য-পুরাণে এই কথার উল্লেখ আছে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বিশ্বকর্ম্মশিল্পশাস্ত্রে সূর্য্যের মূর্ত্তি বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, তিনি একচক্রবিশিষ্ট ও সপ্তাশ্ববাহিত রথে আরূঢ়, প্রভামণ্ডিত, হস্তদ্বয়ে পদ্ম, কুঞ্চিতকেশ, বর্ম্মপরিহিত ও পিঙ্গলাদি অনুচরগণে পরিবৃত। কিন্তু গ্রহগণের মধ্যে তাঁহার যে মূর্ত্তি, তাহাতে উভয় হস্তে পদ্ম ও বাহনরূপে একটিমাত্র অশ্ব দেখা যায়। অংশুমদ্‌ভেদাগমে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট উভয়রূপে চন্দ্র কল্পিত হইয়াছেন। তাঁহার উভয় হস্তে কুমুদ এবং পশ্চাতে প্রভামণ্ডল। শিল্পরত্নের মতে চন্দ্র দশাশ্ববাহিত রথে আরূঢ়, দক্ষিণ হস্তে গদা, বাম হস্তে বরমুদ্রা। মৎস্যপুরাণের অন্যত্র বলা হইয়াছে, চন্দ্রের উভয় পার্শ্বে কান্তি ও শোভা দেবী বিরাজমানা। শিল্পরত্নে আবার কান্তি ও শোভা দেবীর পরিবর্ত্তে একমাত্র রোহিণীকে চন্দ্রের পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মঙ্গল সাধারণতঃ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও কোন কোন স্থলে ছাগবাহন, অষ্টাশ্ববাহিত রথারূঢ়, চতুর্ভুজ, আবার কোথাও দ্বিভুজ। চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয় ও শক্তি এবং বাম হস্তদ্বয়ে শূল ও গদা। দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, বাম হস্তে কমণ্ডলু। চতুর্থ গ্রহ বুধ চন্দ্রের পুত্র। তাঁহার দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয় মূর্ত্তিই দেখা যায়। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি খড়্গ, চর্ম্ম, বর ও গদাহস্ত এবং সিংহবাহন। আর দ্বিভুজ মূর্ত্তির উভয় হস্তে যোগমুদ্রা এবং বাহন সর্প। বৃহস্পতি এবং শুক্রও দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত। চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে বর, অন্য তিন হস্তে কমণ্ডলু, অক্ষমালা ও দণ্ড। দ্বিভুজ বৃহস্পতির এক হস্তে পুস্তক, অন্য হস্তে অক্ষমালা। দ্বিভুজ শুক্রমূর্ত্তির এক হস্তে নিধি, অন্য হস্তে পুস্তক। মতান্তরে উভয়েই দ্বিভুজ, অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারী। বৃহস্পতি হংসবাহন। শুক্রের বাহন ভেক। মৎস্যপুরাণে গৃধ্রবাহনেরও উল্লেখ আছে। শনি সাধারণতঃ বিকৃতাঙ্গ বা খঞ্জ, দণ্ড ও বরমুদ্রাধর, মতান্তরে দণ্ড ও অক্ষমালাধারী এবং অষ্টাশ্ববাহিত লৌহরথে পদ্মপীঠাসীন। অন্যান্য গ্রহের মধ্যে শনির যে মূর্ত্তি, তাহাতে একটি অশ্বই বাহন। শিল্পরত্নের মতে রাহু চতুর্ভুজ, বর খড়্গ খেটক ও শূলধারী এবং সিংহাসনোপবিষ্ট, অন্য মতে তিনি অষ্টাশ্ববাহিত রৌপ্যরথে সমাসীন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে তিনি দ্বিভুজ, পুস্তককম্বলপূর্ণহস্ত এবং পাদপীঠে কুণ্ডের অবস্থান আছে। কেতু সাধারণতঃ দ্বিভুজ, গদা ও অভয়মুদ্রাধর এবং শ্যেনপক্ষী তাঁহার বাহন। বিশ্বকর্ম্মশিল্পশাস্ত্রে কেতুর মূর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার রথ দশাশ্ববাহিত।

এই সকল শাস্ত্রীয় বর্ণনানুসারে আবহমান কাল হইতে প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে গ্রহগণ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অবশ্য পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তির মধ্যে যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম

দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। তবে দাক্ষিণাত্যের ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি বিশেষ প্রাচীন না হইলেও শাস্ত্রানুসারে নির্ম্মিত। শিল্পরত্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি তাহাতে বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়। তাঞ্জোর জেলার সূর্য্যনায়কোইলের মন্দিরে স্থাপিত নবগ্রহের ধাতুমূর্ত্তিগুলি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা হইতে সংগৃহীত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি দাক্ষিণাত্যের ঐ সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা প্রাচীন এবং খ্রীষ্টীয় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্ম্মিত মনে হয়। বিহার হইতে একটি অতি সুন্দর নবগ্রহমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত আর একটি চতুর্গ্রহমূর্ত্তি (বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রাহু) সারনাথে পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তি দুইটি ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত দুইটি নবগ্রহমূর্ত্তির আকৃতি দুই প্রকার। একটিতে গ্রহগণ দণ্ডায়মান অবস্থায় আছেন, প্রত্যেকের বাহন আছে এবং সর্ব্বাগ্রে গণপতি আছেন। গ্রহগণের সহিত গণপতিপূজার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সূর্য্যের স্থান সর্ব্বত্রই প্রধান, এবং এখানেও তাই। তবে এই মূর্ত্তিতে সিংহাসনারূঢ় চন্দ্রের বাহন অশ্বের পরিবর্ত্তে হস্তী। দক্ষিণ হস্তে গদার পরিবর্ত্তে বরমুদ্রা। চন্দ্রের এইরূপ বৈশিষ্ট্য একান্ত বিরল এবং শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেতুর মূর্ত্তি। ইহা স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে খোদিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিকে অঞ্জলিমুদ্রায় অবস্থিত নাগিনীমূর্ত্তি বলিলেও বলা চলে। পরিষদের অন্য মূর্ত্তিটিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ইহাতে গ্রহগণের সহিত যে গজলক্ষ্মীমূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতীব বিরল। গজলক্ষ্মী এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা ও বাম হস্তে পদ্ম বিধৃত। উভয় পার্শ্বে হস্তীর পরিবর্ত্তে হস্তিমুখ মনুষ্য অঞ্জলিমুদ্রায় দণ্ডায়মান। গজলক্ষ্মীর এই মূর্ত্তিটি উপবিষ্ট গ্রহগণের নিম্নবর্ত্তী মধ্যাংশে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনুমান হয় যে, এই মূর্ত্তির যিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পূজক ছিলেন, তিনি ধনাভিলাষী হইয়াই ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেন। মূর্ত্তি দুইটিই বেশ প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

শব্দ-সংগ্রহ

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় ভাগ

এক ॥ কামার[১] বা কর্মকার।
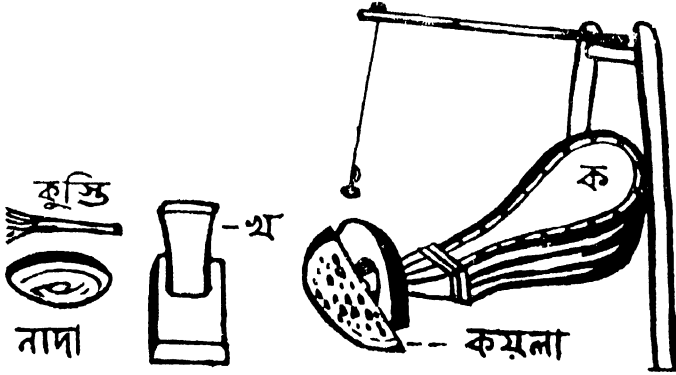
ক—যাঁতা। খ—লি।

যাঁতা—হাপর। লি—নেহাই।

হাপর—ঐ, বহনযোগ্য। (থালাবাসন মেরামতকারীদের প্রয়োজনীয় যাঁতাকে এখানে হাপর বলে)।

ছোট দত্—ছোট হাতুড়ি, ছোট সাঁড়াশি ইত্যাদি।

বড় দত্—ঐ বড়।

খিল সাঁড়াশি।

খিল-সাঁড়াশি—কাঠের তৈরি। এই খিল সাঁড়াশির ভিতর ছোটোখাটো জিনিস আটকাইয়া কর্মকার কাজ করে।

১ আপন কাজে সবাই ব্যস্ত, পরের কাজে কামার ব্যস্ত।—যশোর-খুলনার প্রবাদ।

কামার যা গড়বে, তা মনে মনে আছে।—ঐ প্রবাদ।

পোলাদ্, পোলাত্—ইস্পাত যাহার সাহায্যে লোহার অস্ত্রে ধার হয়।

পা'ন (পাইন)—temper

পা'নোনো—পা'ন দেওয়া।

কুস্তি—নারিকেলের বা খেজুরের পাতার ডাঁটার মোটা অংশ হইতে প্রস্তুত। উত্তপ্ত লোহে জল ছিটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নাদা—জল রাখিবার পাত্র।

দুই॥ কুমোর বা কুম্ভকার।
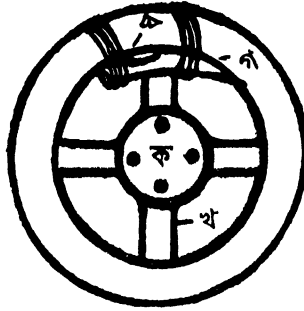
কুমোরের চাক।

ক—পদ্ম। খ—হাতা। গ—ঘোড়া কাঠ। ঘ—এইখানে কাঠি আটকাইয়া ঘুরানো হয়।

আল—'ক' চিহ্নিত অংশের উল্টা দিকের মধ্যস্থ একখানি কাঠ।

জড়ান্—জড়ানো। ঘোড়াকাঠ (গ) যে দড়ির সাহায্যে জড়াইয়া বাঁধা থাকে, সেই দড়িটি।

গৃহস্থালীর কাজে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরে কুমোরের তৈরি জিনিসপত্রাদি অপরিহার্য। হাঁড়ি, শরা প্রভৃতি কুমোরের তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে অতি পরিচিত। 'শরা' সম্পর্কে বহু পরিচিত প্রবাদ—'ধরাকে শরাজ্ঞান করা'।

কয়েকটি জিনিস-পত্রের নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

তোলো হাঁড়ি, বেশালি—গয়লাদের ব্যবহৃত দুধ রাখিবার পাত্র।

কাঁড়ে—দুধ বা তেল রাখিবার পাত্র।

(উচ্চারণ—কাঁ ও ড়ে'র মাঝে অস্পষ্ট ই অথবা—কাঁড়+ইয়ে=কাঁড়ে')

খোলা হাঁড়ি—মুড়ি, চিড়া প্রভৃতি ভাজিবার পাত্র।

টাঠি, খুলি—ছোটো প্রদীপ। কার্তিক মাসের লক্ষ্মীপূজায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত।

দেল্‌কো—প্রদীপাধার।

শানুক, শানকি—জেলে, মাঝি ও মুসলমানদের ব্যবহৃত খাবার রাখিবার পাত্র। ভাত খাইবার থালা হিসাবেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

হাঁড়া, জালা—গুড়, ডাল, কলাই, সরিষা ইত্যাদি রাখিবার বড় পাত্র।

গুড়ের কলসী—গুড় রাখিবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত।

ভাঁড়, ঠিলে—ছোটো কলসী। খেজুর গাছের রস সংগ্রহের জন্য এই ভাঁড় বা ঠিলে পাতা হয়।

কোলা, মাঠে' বা মা'ঠ (মাইঠ)—বীজ ধান, মজা সুপারি ইত্যাদি রাখিবার পাত্র। (মজা-সুপারি—পাত্রের ভিতর জল দিয়া ভিজানো সুপারি)।

ঘট[২]—ছোটো ভাঁড়। (মঙ্গলঘট ইত্যাদি।)

দয়ে হাঁড়ি—দই রাখিবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত।

তিন॥ কলুর[৩] ঘানি।
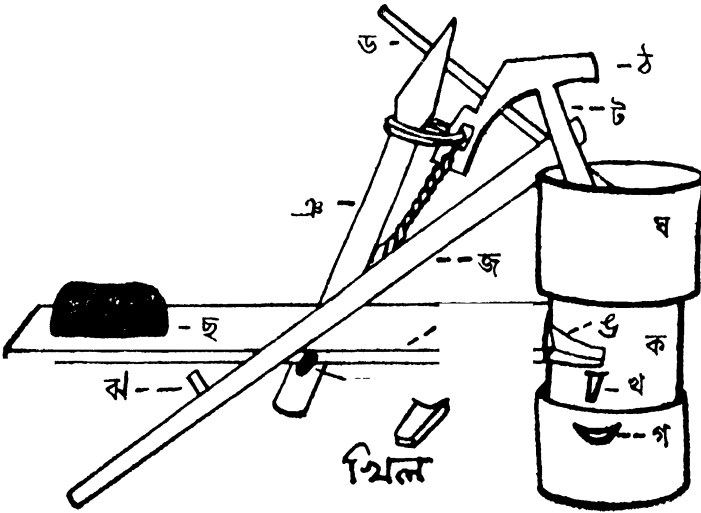
ক—ঘানি গাছ[৪]। খ—নড়। গ—খিল ঘর। ঘ—আড়া। ঙ—ফ্যাট কাঠ। চ—কাতুর। ছ—ভারা, পাথর। জ—যোঁয়াল। ঝ—সোমরাইল। ঞ—মাথম। ট—জাঠ। ঠ—মাড়ি কাঠ। ড—আলে' কাঠ। ঢ—টিক।

আলে' কাঠের (ড) সাহায্যে আড়া (ঘ) মধ্যস্থ শুক্‌না সরিষা বা নারিকেলের টুকরাগুলি নাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং জাঠের (ট) সাহায্যে উহা পিষ্ট হয়।

নড় (খ)—এই জায়গা হইতে তেল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে।

২। ঘট গড়তি (গড়িতে) পারে না আবার মাঠের বায়না নেয়!—যশোর-খুলনার প্রবাদ (অর্থাৎ—ছোট কাজের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বড় কাজে হস্তক্ষেপের চুক্তি করা)।

৩। 'মা আমারে ঘুরাবি কত, কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত'—রামপ্রসাদী গান।

৪। 'ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত'—রামপ্রসাদী গান।

খিল ঘর (গ)—এই খিল-ঘরের মুখে খিল লাগানো থাকে এবং নীচে তেলের পাত্র বসানো থকে।

বাটাল—নড় (খ)-এর মুখে তেল বাহির হইবার পথ পরিষ্কার করিবার কাঠি।

চার॥ নৌকা।

জলপথে গ্রামান্তরে যাইতে পূর্ববঙ্গে নৌকাই একমাত্র সুলভ বাহন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে নৌকার প্রয়োজন ও উপকারিতা অনস্বীকার্য। এইদিক হইতে সমাজে নৌকার বিশেষ দান আছে। নৌকাযোগে বিদেশ গমন ও বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষে নৌকাযাত্রীর মঙ্গলকামনা করিয়া নৌকার পূজা বাংলাদেশের সুপ্রাচীন রীতি। তা ছাড়া পল্লীকবিরা নৌকা, নৌকার বিভিন্ন অংশ এবং তার বিচিত্র গঠন মানব দেহের গঠনের সূক্ষ্ম কারিগরির সঙ্গে তুলনা করিয়া গান রচনা করিয়াছেন। গানে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসাও করা হইয়াছে। এই ধরণের গানগুলি ভাব-গান নামে পরিচিত। ভাব গান দেহতত্ত্ব-মূলক। এই প্রসঙ্গে যশোর-খুলনার এক পল্লীকবি সচ্চিদানন্দ ভারতী রচিত একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।—আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। (গানটি মৎ-সংগৃহীত যশোর-খুলনার ভাব গানের অন্তর্গত)।

মনারে বেলা যাবে বইয়া—
দিনের আলো বন্ধ হলে
অন্ধকারে ক্যামনে যাবি বাইয়া॥

যোগে যাগে তক্তার যুড়ি,
কাঠ দিয়াছে বাহাদুরী
সংযমে পাতামে জোড়া দিয়া—
অনাচারের লোনা জলে
কাঠ যাবে তোর খাইয়া॥

বিবেক গলুই নড়াচড়া,
খসে যাবে ভক্তির দড়া,
ভাবের গুড়ো যাবেরে নড়িয়া—

জ্ঞান মাস্তলে ভক্তির পালে
বাদাম দাও তুলিয়া।
বিশ্বাসের হাল নড়ে গেলে
মর্‌বিরে তলাইয়া॥

—সচ্চিদানন্দ ভারতী
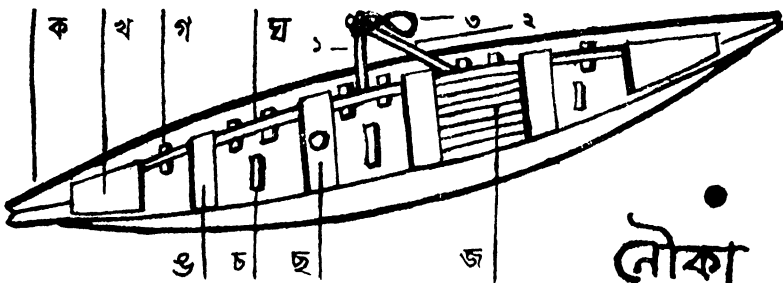
ক—মুড়ি, মুড়ো। খ—গলুই, গোলোই। গ—টিক, পাশ দাঁড়া।[৫] ঘ—বাতা। ঙ—গুড়ি, গুড়ো।[৬] চ—বাগ, মাঝ দাঁড়া। ছ—পাল গুড়ো। জ—পাটাতন।

১—থিয়ে কাঠ।

২—কাতে কাঠ। দুইয়ের মিলিত নাম ইস্‌নে।

৩—ষাড়া।

নৌকার বিভিন্ন অংশ ॥

আগা লা'—নৌকার অগ্রভাগ।[৭] (মুড়ি ও গলুই অংশ একত্রে। পাছা লা' হইতে আগা লা' অপেক্ষাকৃত সরু)।

পাছা লা'—নৌকার পশ্চাৎভাগ। (ঐ—মুড়ি ও গলুই একত্রে)। এই দিকেই সাধারণতঃ হালের মাঝি বসে। লা, লাও, নাও, না[৮]—নৌকা।

গোলুই, গোলোই—নৌকার ঠিক অগ্রভাগের ত্রিভুজাকৃতি কাষ্ঠ খণ্ড।

পাটাতন—নৌকার ভিতরকার তক্তার বা চেরা বাঁশের আচ্ছাদন। লোকের বসিবার জন্য।

খোল—নৌকার 'ফ্রেম' ও তক্তার আচ্ছাদনের মধ্যের শূন্য জায়গা।

ডরা[৯]—নৌকার খোলের ঠিক মাঝখানটা, অর্থাৎ ফ্রেমের ভিতর দিকের মধ্যস্থল।

৫। পাশ দাঁড়া, মাঝ দাঁড়া :—

"কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।
শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে।।"—পৃ. ৫৫ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড।

দাণ্ডা—নৌকার মধ্যদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড।—পৃ. ২৩৩। ঐ, টীকা।

৬। তাত গুড়া যোড়ী দিল তোলঝাপে।—পৃ ৫৫, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড।

সূর্য্যের প্রাচীন গানে—

শ্রীফলগাছের নৌকাখানি মধ্যে যোড়-গুড়া।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে—

তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খতালি।
চন্দনকাষ্ঠে তার গুড়া আর ডালি।।

কবিকঙ্কণে—

গড়ে ডিঙ্গা মধুকর　　মাঝখানে ছইঘর
পাশে গুড়া বসিতে পাবর।

৭। আগা লা' যেদিকে যায়, পাছা লা'ও সেদিকে যায়।—যশোর-খুলনার প্রবাদ।

৮। দ্র° শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড। পৃ ৫৮, ৬১, ৬২। বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত।

৯। পসার নাম্বাআঁ থোহ ডহরার মাঝে।
দধির চুপড়ি রাধা থুইল ডহরাএ।।—পৃ. ৬০, ৬২—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড।

(ডরা—উচ্চারণে ড' এবং রা' মাঝে খুব অস্পষ্ট হ'র মত একটা শব্দ শোনা যায়। ফলে ড'র উচ্চারণ পরিষ্কার ড নয়। ড ও ঢ এর মাঝামাঝি এক রকম)

ছই বা ছাপ্পড়—নৌকার চাল। ফুকোর—জানালা।

নৌকা বাহনে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ॥

হাল—হা'ল (উচ্চারণ—হাইল। ই—পরিষ্কার নয়)

বৈঠেক, বোঠে—বৈঠা।[১০]

দাঁড়, দাড়—বড় নৌকা বাহিতে ব্যবহৃত। হাল বা বৈঠা হইতে ইহা আকারে বড় ও পৃথক্।

দাঁড়ের পাতা—জলের ভিতরে দাঁড়ের যে চ্যাপ্টা অংশ থাকে।

ষাড়া—নৌকার সহিত দাঁড় বাঁধিয়া রাখিবার জন্য দাঁড়ের মধ্যস্থলে যে মোটা দড়ির বাঁধন দেওয়া হয়, সেই দড়িটি।

পাড়া, চোড় বা লগি—লম্বা ও সরু বংশদণ্ড। তীরের নিকট অল্প জলে নৌকা চালাইতে ইহার সাহায্য লওয়া হয়। তা ছাড়া নৌকা থামাইয়া নৌকার গা ঘেঁষিয়া পাড়া পুঁতিয়া তাহার সহিত দড়ির সাহায্যে নৌকা বাঁধিয়া রাখা হয়।

ছ্যাঙোৎ বা ছ্যাওট,[১১] কাঠকো—নৌকার ভিতরকার জল সেঁচিবার জন্য কাঠের তৈরি পাত্রবিশেষ।

ছ্যাওচ—নৌকার জল সেঁচিবার জন্য টিনের তৈরি পাত্র।

বাদাম[১২]—পাল।—কাপড়ের তৈরি।

পাল—ছোটো আকারের বাদাম।

বিভিন্ন জাতীয় নৌকার নাম ॥

ডিঙ্গি—ছোটো নৌকা।

জেলে ডিঙ্গি—জেলেদের ব্যবহৃত ছোটো নৌকা।

খেয়া নৌকো—খেয়া পারাপারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চালবিহীন নৌকা।

১০। 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না'।—পল্লীগীতি।

১১। পাটুনি বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখো ও রাঙ্গা চরণ॥—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৮১। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত।)

১২। 'বাদাম উড়াইয়া দাও, ওরে মাঝি ভাই'—পল্লীগীতি।

ছিপ[১৩] বা হাটুরে নৌকো—সরু এবং লম্বা, দ্রুতগামী। ব্যবসায়ীরা হাটে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে এই নৌকা ব্যবহার করে।

ভাওয়ালে, পান্‌সী, বোট ইত্যাদি—ধনীদের ব্যবহারোপযোগী নৌকা।

গয়না বা গহনার নৌকো—নির্দিষ্ট স্থান হইতে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাত্রী লইয়া যে নৌকা যাতায়াত করে।

টাবুরে বা টাপুরে নৌকো—যাত্রীবাহী নৌকা।

(টাবুরে মাঝি—টাপুরে নৌকার মাঝি।)

গোলের নৌকো, ধানের নৌকো, কাঠের নৌকো—যথাক্রমে ঘরের চালের গোলপাতা, ধান এবং কাঠ-বোঝাই নৌকা। কেবলমাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। এই নৌকাগুলির বিশেষত্ব—নৌকার খোল প্রায় এক-মানুষ-সমান গভীর এবং প্রয়োজনানুযায়ী তার বেশিও হয়—যাহাতে বেশি মালপত্র ধরে।

পাতাম নাও, খিলেম নাও, তেকাঠে নাও, পাঁচ কাঠে নাও ইত্যাদি—গড়নের বিভিন্নতা অনুসারে এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের নৌকার নাম শোনা যায়।[১৪]

বাইচ-এর নৌকো—প্রধানতঃ জেলেরা দুর্গাপূজা উপলক্ষে এই রকম নৌকায় দুই দলে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। ভদ্র শ্রেণীর লোকের মধ্যেও ইহার প্রচলন আছে। খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দলের লোকেরা কাঁসর বাজায় এবং প্রতিযোগিতা চলাকালীন এক রকম গান করে, সেই গানকে যশোর-খুলনায় সা'র বা সারি' বলে। নৌকার গায় বিচিত্র আলপনায় অলঙ্কৃত থাকে।[১৫] খেলায় হারজিত উপলক্ষে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

পাঁচ ॥ মাঝির ভাষা।

মাঝিমাল্লাদের ব্যবহৃত কথা—বিশেষ করিয়া নৌকা চালানো পেশাসংক্রান্ত কথাগুলি পরিভাষা হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য।

গাঙ[১৬]—নদী।

উজোন্—উজান।

উজোনো—উজানো। স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া।

গোণ[১৭]—অনুকূল স্রোত।

১৩। 'ছিপ্ খান তিন দাঁড়'—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৪। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা. ১৩৩১ সাল, ২য় সংখ্যা, খুলনা জেলার মাঝির ভাষা—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

১৫। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৮৫-৮৬।

১৬। কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী। তুমি হও গহীন গাঙ্গ, আমি ডুব্যা মরি।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা পৃ. ১২।:৯৫২ খৃঃ।

১৭। গোণ প'লি (পড়লি—পড়িলে) বোঝে না সেই বা কেমন না'য়ে (নৌকাচালক), আর কথা প'লি বোঝে না—সেই বা কেমন মেয়ে।—যশোর-খুলনার প্রবাদ

বেগোণ[১৮]—প্রতিকূল স্রোত।

জোগার গোণ—ভরা কোটাল।

মরানি গোণ—মরা কোটাল।

ভাটি, ভাটিকার গোণ—ভাটা।

ভাটানো—ভাটার টানে ভাসিয়া যাওয়া বা আগাইয়া যাওয়া।

সারভাটি বা রায়ভাটি—শেষ ভাটা যখন স্রোতের বেগ অত্যন্ত বেশি হয়।

পিঠেন বাতাস—অনুকূল বাতাস।

মুহোড় বাতাস—প্রতিকূল বাতাস।

সোঁত—স্রোত। (সোঁতা—নালা)

নৌকো বা'র (বাহির) দেওয়া—নৌকাকে কূল হইতে নদীর ভিতরে বাহির করিয়া আনা।

নৌকো ভিতর দেওয়া—ঐ বিপরীত।

নৌকো পাড়ি দেওয়া—আড়াআড়িভাবে নদী পার হওয়া।

নৌকো উবোড় দেওয়া—নদীতে জায়গায় জায়গায় বাঁধ থাকে। অনন্যোপায় হইয়া সেই পথে নৌকায় যাইতে হইলে জোয়ারের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। জোয়ারের সময় বাঁধের সমান জল হইলে আরোহীসমেত নৌকাখানা টানিয়া বাঁধের অপর প্রান্তে লওয়া হয়। ইহাকে উবোড় দেওয়া বলে।

কানাল—গভীর স্রোত।—সাধারণতঃ ভাঙ্গন পারের দিকে।

তোড়—স্রোতের প্রাবল্য।

তিরমুনি—ত্রিমোহনা।

বাক, বাঁক—মোড় (turn)

ভ্যাম্‌তা—নদীর মোড়।

ঘোচ—ছোটো ছোটো বাঁক।

ঘোল্ বা ঘোলা—ঘূর্ণাবর্ত।

কাচি চর—সম্প্রতি যে চর পড়িতেছে, কাঁচা চর।

ভাঙ্গন[১৯]—ভাঙ্গিয়া যাওয়া, নদী তীরের ভাঙ্গন।

পয়ান—খালের মুখে যে বাঁধ থাকে, তাহার স্থানে স্থানে বর্ষাকালে খালের ভিতরে ঢুকিবার জন্য পথ থাকে। তাহার নাম পয়ান।

বাঁধলা—খালের বা নদীর মুখের বাঁধ।

১৮। বেগোণে মরে নায়ে (নাইয়া—মাঝি)। ঐ প্রবাদ।

১৯। নদীর একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা।—পল্লীগীতি।

সচরাচর ব্যবহৃত মাঝিদের কথাবার্তার নমুনা॥

গোলোইতি পা দিয়ে ওঠফেন (ওঠবেন—উঠিবেন) না, বাবু।

ডরায় জল জমেছে, ছ্যাওটখান্ / কাঠকোখান্ নিয়ে জল্‌ডা ছেঁচে ফ্যালা।

বোঠে বাতি (বাহিতে—বাইতে) না পারিস তো হাটুরে লায় আসিস্ কেন ?

পাতায় জল পায় না, কেমন দাড় বা'স (বাহিস্) ?

এমন বাতাসে বাদাম না খাটাবি তো কবে খাটাবি ?

তাড়াতাড়ি যাতি (যাইতি—যাইতে) চাও তো পাড়া মারো / লগি মারো / লগি ঠ্যালো।

আমার এ নতুন ছই বাবু, এক ফুটও[২০] (এক বিন্দুও) জল পড়বে না।

গুণটানার সময় দেখ্‌তি (দেখিতে) হয়, কিসি (কিসে) বাধে।

ছয়॥ জাল ও জেলে।

জালে' বা জেলে—যে জাল ফেলিয়া এবং তাহার সাহায্যে মাছ ধরে।

জাল—যাহা দ্বারা জেলেরা মাছ ধরে।

জালি—ছোটো আকারের জাল।

খ্যাওন, খ্যাপ—ক্ষেপণ। এক একবার জাল ফেলাকে এক এক 'খ্যাপ' বলে।

খ্যাওন দেওয়া বা খ্যাওন মারা—জাল ফেলা।

বিভিন্ন প্রকারের জালের নাম॥

খ্যাপ্‌লা বা খ্যাওলা জাল—অতি সাধারণ জাল।

বাচাড়ি জাল—ঐ প্রকারের বড় জাল। নৌকায় তিন জনে ধরিয়া ব্যবহার করে।

ছাক্‌না জাল বা শাংলে জাল—যাহা জলে ডুবাইয়া ছাঁকিয়া এবং টানিয়া মাছ ধরা হয়।

কাঠি জাল—যে জাল পুকুরে লম্বালম্বিভাবে ভাসাইয়া রাখা হয়। উহাতে খয়রা নামক ছোটো ছোটো মাছ ধরা পড়ে।

ব্যাশাল বা ছিট্‌কে জাল—বিশাল জাল, যাহা দ্বারা এককালে পুকুরের প্রায় অধিকাংশ মাছ ধরা যায়।

বেউতি বা বেংটি জাল—যে জাল নদীর স্রোতে পাতিয়া রাখা হয়।

গোবা জাল—যে জাল ৪।৫ জন লোকে পুকুরের মাঝামাঝি টানিয়া মাছ ধরে।

২০।　বিপি যাচিলেঁ　কাহাকো না দিব
এনা এক ফুট পাণী ॥
—পৃ. ৯৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, যমুনাখণ্ড। বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত।

বেড় জাল—উপরোক্ত গোবাজাতীয়। ইলিশ মাছ ধরিতে ব্যবহার হয়।

টানা জাল—এই জালের একটা মোটা ভারী দড়ি দুই ধারে দুইজন লোক পুকুরের পাঁকে বসাইয়া টানিতে থাকে এবং দলের অপর ব্যক্তিরা তখন হাত দিয়াই মাছ ধরিতে থাকে।

কোমর জাল—গাঙে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছোটো ছোটো গাছপালা ফেলিয়া রাখা হয়। ইহাকে 'কোমর বাঁধা' বলে। ঐ কোমরের ভিতর বিভিন্ন প্রকারের মাছ আসিয়া আশ্রয় লয়। পরে ঐ কোমরের চারিপাশে জাল দ্বারা ঘিরিয়া মাছ ধরা হয়—এই জালের নাম কোমর জাল।

কুঁড়ো জালি—বস্ত্র খণ্ড হইতে তৈরি এক প্রকার জাল। ইহার উপর চাউলের কুঁড়ো (খুদ-কুঁড়ো) ভাজা রাখিয়া জলে ভাসাইয়া মাছ ধরা হয়।

আটান্ জাল—ভেট্‌কি মাছ ধরিতে ব্যবহার হয়।

ফাঁস জাল—ঐ। নদীতে স্রোতের সঙ্গে ভাসাইয়া রাখা হয়।

কোনা জাল—ছোটো ছোটো যে কোন মাছ ধরিতে ব্যবহার হয়। আশপাশ হইতে মাছ তাড়াইয়া এই জালের ভিতরে ঢোকানো হয়।

জালের সাহায্যে মাছ ধরা সংক্রান্ত বিষয়॥

কোমর বাঁধা—গাঙে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছোটো ছোটো গাছপালা ফেলিয়া রাখা হয়। উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকারের মাছ আসিয়া এখানে জমা হইবে। ইহাকে কোমর বাঁধা বলে।

ঝা'ল বা ঝাইল—কোমর বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত গাছপালাকে ঝা'ল বলে। ঐ প্রকার গাছপালা কাটাকে ঝা'ল কাটা এবং ঐ গাছপালা গাঙে ফেলাকে ঝা'ল দেওয়া বলে।

(উচ্চারণ, ঝাল বা ঝাইল পরিষ্কার নয়।—'ই' অস্পষ্ট। প্রায় আইল্-এর মত।)

উজোল দেওয়া—বেউতি বা বেংটি জালের মাছ বাহির করা।

উজোলের মাছ—ঐ বেউতি বা বেংটি জালের মাছ।

বড় বেংটির মাছ—বড় বেংটি জালের সাহায্যে ধরা মাছ।

হাপর—বাঁশের চটা (বাখারি) হইতে প্রস্তুত। ১০।১৫ হইতে ২৫।৩০ মণ পর্যন্ত মাছ রাখিবার জন্য বিভিন্ন আকারের পাত্র।

হাপরের মাছ—জালের সাহায্যে ধরা মাছ সমেত এই পাত্র নদীর জলের ভিতরে রাখা হয়। ফলে ৩।৪ দিন পর্যন্ত মাছগুলি জীবন্ত থাকে। কিন্তু এইভাবে রাখা মাছের গায়ের ছাল কিছু কিছু উঠিয়া যায়। তাহা দেখিয়া হাপরের মাছ বলিয়া সহজেই ইহাদের চেনা যায়।

ডালি—বাঁশের বেতি হইতে প্রস্তুত। প্রায় আধ মণ-তিরিশ সের পর্যন্ত মাছ ইহাতে ধরে। জেলেরা এই পাত্রে মাছ রাখে এবং হাটে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে লইয়া যায়।

খারাই—বাঁশের সূক্ষ্ম বেতি হইতে প্রস্তুত। ইহাতে ৪।৫ সের পর্যন্ত মাছ ধরে।

পিপে—বয়া।

জেলে ডিঙি—মাছ ধরিবার সময় জেলেরা যে নৌকা ব্যবহার করে।

ভেলা[২১]—কলাগাছের কাণ্ড হইতে তৈরি। অল্প জলে কূলের দিকে যাইতে ব্যবহৃত হয়।

জাল ভিন্ন অন্য উপায়ে মাছ ধরা॥

পোলো—বাঁশের সূক্ষ্ম বেতি হইতে তৈরি। অল্প জলে একজন লোকে মাছের অস্তিত্ব বুঝিয়া যন্ত্রটি সেইখানে চাপিয়া ধরে। ইহার উপরের মুখ, যে কোনো একজনের হাত ভাল ভাবে ঢুকিয়া যাইতে পারে এমন পরিধিবিশিষ্ট এবং নীচের পরিধি প্রায় এক হইতে দেড় হাত পর্যন্ত হয়। এই নীচের দিক পাঁকে বসিয়া যায়।

চাবি, ঘুনশি।—ঐ জাতীয়। ভিন্ন আকারের।

হাতসুত—২৫।৩০ হইতে ৫০।৬০ হাত সুতার মাথায় বড়শীতে চিংড়ি মাছ, কেঁচো বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো মাছের খাবার গাঁথিয়া নদীতে ছুঁড়িয়া ফেলা হয়। সুতার এক প্রান্ত মৎস্য-শিকারির হাতে থাকে—তাই ইহার নাম হাত সুত।

চার—মাছের খাদ্য—যাহা মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে বড়শিতে গাঁথা হয়।

চারো—বাঁশের বেতি হইতে তৈরি। অল্প স্রোতে রাখা হয় এবং ইহাতে মাছ আটকাইয়া যায়।

ঝোপ—লম্বা একটা দড়ির গায়ে সুতায় বাঁধা একাধিক বড়শি চারসমেত ঝুলিতে থাকে। পুকুরে বা নদীর ধারে টানাইয়া রাখা হয়।

খোপা—কাঁকড়া মাছ ধরিবার ছিপ। দুই-আড়াই হাত লম্বা বাঁশ বা লাঠির আগায় মোটা দড়িতে চার বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

খোপার কাঁকড়া—খোপার সাহায্যে ধরা কাঁকড়া মাছ।

খুঁট—বড়শির অগ্রস্থিত চার মাছে খাইলে সুতায় যে টান পড়ে তাহাকে খুঁট বলে।

পাত্‌না বা ফাত্‌না—ছিপের সুতার মাঝখানে পাটকাঠি বা ময়ূরের পাখনার খানিকটা আটকানো থাকে; উহা জলে ভাসিতে থাকে। ইহাই পাত্‌না বা ফাত্‌না। খুঁটের টানে পাত্‌না নড়িতে থাকে। ইহার ফলে, যে ব্যক্তি মাছ ধরে সে বুঝিতে পারে, মাছে চার খাইয়াছে।

জাল বুনিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের নাম॥

চৌরী—জাল বুনিবার সুতা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রবিশেষ।

নাটাই—আউলা (আউলো—আ'লো) বা খোলা সুতা ৩।৪ খে' (বা খিয়ে—তার) করিয়া গোছাইতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

২১। তুমি সর্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,
কূলে এনে দিতে পারো।—কবিয়াল রাম বসু।
—প্রাচীন কবি সংগ্রহ, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ১ম খণ্ড, পৃ. ২। ১২৮৪ সাল।

টাকুর—নাটাই দ্বারা সুতা গোছাইয়া পরে এই যন্ত্র দ্বারা সুতা পাকানো হয়।

ছোটো চরখা—পাকানো সুতা রাখিতে ব্যবহৃত হয়।

তৌল ও ফল্‌ড়ি—জাল বুনিবার যন্ত্র। বাঁ হাতে তৌল ও ডান হাতে ফল্‌ড়ি ধরিয়া জাল বোনা হয়।

জালের বিভিন্ন অংশের নাম॥

বর—যে দড়ির সাহায্যে ঘাইল জালের শেষে পকেটের মত তৈয়ারি হইয়া থাকে।

ঘা'ল বা ঘাইল—জালের শেষ অংশ—পকেটের মত। যাহার ভিতর মাছ আটকাইয়া থাকে।

জাঙ্গাল—ঘাইলের উপরের অংশ।

মাল্যে—জাঙ্গালের উপরের অংশ।

চুড়ো—জালের গোড়া। যেখানে জালের দড়ির একপ্রান্ত বাঁধা থাকে। অপর প্রান্ত জেলের হাতে থাকে।

পালাশি—যে দড়ি দ্বারা ঘাইলের সহিত লোহার কাঠিগুলি বাঁধা থাকে।

কাঠি বা গাঁঠে (গাঁইঠ—গেঁঠে)—লোহার তৈরি। দেখিতে মাদুলির মত। পালাশির সাহায্যে এইগুলি ঘাইলের সহিত বাঁধা থাকে।

সাত॥ খেজুর গাছ কাটা ও খেজুর গাছের রস সম্পর্কীয় শব্দ।

গাছ ওঠানো।—গাছের ডালপালা কাটা।

সাধারণতঃ কার্তিক মাসের ১৫ দিনের পর হইতে অথবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে গাছ কাটা আরম্ভ হয়।

ভুঁতি মারা—গাছের ডালপালা কাটিয়া সমান করা।

চাঁচ দেওয়া—চাঁচা।—ইহার পর প্রথম রস বাহির হয়।

খিল দেওয়া—ভাঁড় ঝুলাইবার জন্য গাছের চাঁচা অংশে কাঠি আটকানো।

উড়োন দড়ি—যে দড়ির সাহায্যে গাছে ভাঁড় ঝোলানো হয়।

কানাচ দড়ি—দড়ির যে অংশ ভাঁড়ের গলায় আটকানো থাকে।

গাঁতা—প্রথম দিন গাছ কাটিবার পর দ্বিতীয়বার গাছ কাটিবার দিনের মাঝে যে কয়দিন দেরি করা হয় সেই সময়কেই গাঁতা বলে।

গাছি—যে লোক গাছ কাটে এবং ঐরকম কাজ হইতে জীবিকার্জন করে।

ঠুঙ্গি—গাছ কাটিবার জন্য দা, দড়ি ইত্যাদি রাখিবার জন্য বাঁশের বেতি হইতে তৈরি পাত্র। ইহা গাছির কোমরে পিছন দিকে আটকানো থাকে।

আঁকড়া—ঠুঙ্গির গায়ে আঁকড়ার সহিত ভাঁড় আটকানো থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের রস ॥

চাঁচের রস—গাছ কাটার পর প্রথম দিনকার রস।

ফুল চাঁচের রস—চাঁচ দেওয়ার ৭ দিন পরে পুনরায় কাটার ফলে যে রস পাওয়া যায়।

নলেন রস—ফুল চাঁচের ৭ দিন পরে যে রস পাওয়া যায়।

জিরেন—নলেন-এর ৭ দিন পরে যে রস পাওয়া যায়।

ওলা রস—যে কোনো দিন সকালে প্রথমবার রস পাড়িবার পর দ্বিতীয় বার ভাঁড় পাতা হয়। সেইবারে যে রস হয় তাহা ওলা রস এবং তাহা সেইদিনই বিকালবেলায় পাড়া হয়।

দোকাট—মাঘ মাসের ১৫ দিনের পর হইতে যেদিন গাছ কাটা হয় তাহার পরদিনই বিকালে গাছ কাটার নাম দোকাট দেওয়া বা দ্বিতীয় বার কাটা।

ওলা—দোকাটের পরেও যদি গাছে রস বেশি হয় তাহা হইলে সেই রস পাইবার জন্য আবার ভাঁড় পাতা হয়। এই রসকে ওলা রস বলে।

ঝরা—ওলা রস পাওয়ার পর এইদিনই বিকাল বেলায় ভাঁড় পাতিয়া রাখা হয়। এবং রাত্রিতেই যে রস পাওয়া যায় তাহাকে ঝরা রস বলে।

নিমঝরা—ঝরা রসের পরেও যদি গাছে রস থাকে তবে ঝরা রস পাওয়ার পরদিন আবার ভাঁড় পাতা হয়। এইবারে যে রস পাওয়া যায় তাহাকে নিম ঝরা বলে।

আট ॥ ওজন ও গণনা পদ্ধতি।

ওজন করিবার যন্ত্রপাতি ॥

দাঁড়িপাল্লা—জিনিসপত্র ওজনের যন্ত্র।

পাল্লা—দাঁড়ির সহিত সংযুক্ত যে পাত্রের উপর জিনিস রাখিয়া জিনিস ওজন করা বা মাপা হয়।

মাপা—ওজন করা।

কাঁটা—লোহার তৈরি অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। ১৫।২০ সের হইতে দুই তিন মণ বা ততোধিক পরিমাণ জিনিস মাপিবার জন্য।

লিক্তি বা নিক্তি—ছোটো আকারের পিতলের তৈরি।—সোনা রূপা ওজনের যন্ত্র।

(নিক্তির ওজন, কাঁটার ওজন বা সোনার ওজন।—প্রবাদ। অর্থাৎ, খুব সূক্ষ্ম ওজন।)

দাঁড়ি—কাঠের, বেতের বা লোহার পাল্লা দুইখানি যে দণ্ডের (কাঠ বা লোহার) সহিত দড়ি দ্বারা যুক্ত থাকে।

নেতি—যে দড়ি ও কাপড় দ্বারা প্রস্তুত গুটুলী (ডেলার আকৃতি) হাতে ধরিবার উপযুক্ত করিয়া দাঁড়ির মধ্যস্থ ছিদ্রে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

দড়ি—যে তিনটি বা চারিটি দড়ি দ্বারা পাল্লাকে দাঁড়ির সহিত যুক্ত করা হয়।

পাশান্[২২]—স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ কোন জিনিস না চাপাইয়া দাঁড়িপাল্লার পাল্লা দুইখানির কোন একখানি কোন এক দিকে ঝুকিয়া থাকিলে, দাঁড়িতে 'পাশান্' আছে বলা হয়।

পাশান্ ভাঙ্গা।—ঐ পাশান্ সমান করিবার জন্য মাটির বা পাথরের ডেলা প্রয়োজন মত দিয়া পাল্লার ভার সমান করা হয়। ইহাকে 'পাশান্ ভাঙ্গা', বা 'কর্‌তা করা' বলে।

ফের দেওয়া—উপরোক্ত পাশান্ না ভাঙ্গিয়া দাঁড়িপাল্লায় জিনিস মাপা। ফলে জিনিস কম বেশি হয়। ইহার প্রতিকারস্বরূপ—প্রথম মাপের সময় একদিকে এবং দ্বিতীয় মাপে অপর দিকে জিনিস রাখিয়া মাপা হয়। ফলে প্রথম মাপে কম বা বেশি হইলে দ্বিতীয় মাপে বেশি বা কম হইয়া সমান হইয়া যায়।

(ফেরা—ঝঞ্ঝাট। ফেরে পড়া—বেকায়দায় পড়া। গ্রহের ফের)

বাটখারা—ওজনের পরিমাণজ্ঞাপক বিভিন্ন মাপের লৌহপিণ্ড। যথা, এক কাঁচ্চা, এক তোলা, আধ ছটাক, এক ছটাক, আধ পোয়া বা দু ছটাক, এক পোয়া বা চার ছটাক, আধ সের বা আট ছটাক, এক সের (বা ষোল ছটাক বা ৬৪ কাঁচ্চা বা ৮০ তোলা), দশ সের, আধ মণ বা বিশ সের, এক মণ বা চল্লিশ সের ইত্যাদি মাপের বাটখারা থাকে।

কয়াল বা ব্যাপারী—গ্রামাঞ্চলের ধান-চালের কারবারী।

ফাউ বা ফাঁও[২৩]—ক্রেতার প্রার্থিত মত জিনিস দিবার পরে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিক্রেতা বিনামূল্যে যৎসামান্য পরিমাণ সেই জিনিস দেয়। ইহাকে ফাউ বা ফাঁও বলে।

দুধের ওজন ॥

এক বাংলা—এক পোয়া।

দু' বাংলা—আধ সের। চার বাংলা—এক সের।

কাঁচি সের—৬০ তোলা। কাঁচি—কাঁচা।

পাকি সের—৮০ তোলা। পাকি—পাকা।

খুলনার কয়েক জায়গায় 'বিশ সিকে' সের=পাঁচ পোয়া, ১২০ তোলা বা দেড় সের= এক সের প্রচলন আছে।

২২। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে—পাষাণ। দ্র° বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ, পৃ. ৫৬৮। ১৩২১ সাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাশান্—এক পাশ হইয়া থাকা অর্থাৎ দাঁড়ির দুই পাশ সমান না থাকা বা, যে কোনো এক পাশ অসমান থাকা, ইহাই—পাশান্ বলিয়া মনে করি।—এখন ভাষা তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বিচার করুন।

২৩। সের পোয়ে না আবার ফাউ!—প্রবাদ।

চাউল ও ধানের মাপ ॥

এক পালি—সাধারণতঃ পাঁচ সের।

পালি বা পালে'—বেতের তৈরি পাত্রবিশেষ।

কুন্‌কে, খুঁচি—চাউল মাপিবার বেতের তৈরি ছোটো পাত্র। পাঁচ ছটাক, দশ ছটাক ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের।

এক শলা বা এক শলি।—ধানের ওজন। ২০ পালি ধানকে এক শলা ধান বলে।

পাঁচ-সেরা পালির ২০ পালিতে ধানের ওজন অনুমান ১২ মণ হইতে ১ মণ ২৫ সের। ঐ রকম ২০ পালি ধান হইতে অনুমান ১ মণ ১০ সের চাউল বাহির হয়।

গণনা পদ্ধতি ॥

এক ॥

মাছ, ফল ইত্যাদি ২৬টায় এক কুড়ি।

যশোরের নড়াইল অঞ্চলে ২৪টায় এক কুড়ির প্রচলন আছে।

দুই ॥

গুয়ো (গো') বা সুপারী ॥

৪টায়—এক গণ্ডা। ১০টায়—এক গা।

২০ গা' বা ৫০ গণ্ডায়—এক কুড়ি।

কোনো কোনো জায়গায় ১১টায় এক গা এবং ৫৫ গণ্ডায় এক কুড়ির প্রচলন আছে।

তিন ॥ পান ॥[২৪]

নানা রকম মশলা সহযোগে খাওয়া ব্যতীত বিবাহে, পূজাপার্বণে এবং কবিরাজী ঔষধের অনুপান হিসাবে বাংলা দেশে পানের ব্যবহার বহু প্রচলিত এবং সুপ্রাচীন। তা'ছাড়া অভ্যাগতকে পান দিয়া সম্মান করা সুপ্রচলিত রীতি। পান দিলে তাহা গ্রহণ না করা অভদ্রতা বলিয়া গণ্য হয়।

২০ গণ্ডায় এক পণ এই হিসাবে পান বিক্রি হয়।

২৪। 'হাথে গুয়া লিল বিশাই শিরে বন্দে পান্।'—রামাইপণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধান, পৃ. ১৯২।
—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩২৩ সাল।

আয় রঙ্গ হাটে যাই। বা, আয় কম্‌লা হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই। পান গুয়োটা কিনে খাই।
লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ—পৃ. ৫১-৫২। বিশ্বভারতী, ১৩৫৯ আশ্বিন।

বিক্রেতারা পান যে-বাণ্ডিলের ভিতর সাজাইয়া রাখে তাহার নাম গাদি। গাদির ভিতরে পান যেভাবে সাজানো থাকে—

৪টায় ১ গণ্ডা'র

৭ গণ্ডা = ১ লাচ (২৮টি)

১৪ গণ্ডা বা

২ লাচ = ১ গোচ বা ১ বিড়ে (৫৬টি)

১০ বিড়ে = ৭ পণ (৫৬০টি)

২০ গণ্ডা = ১ পণ (৮০টি)

৪ পণ = ১ কোনা (৩২০টি)

৪ কোনা বা

১৬ পণ = ১ কাহন (১২৮০টি)

৬৪ পণ বা

৪ কাহন = ১ কুড়ি (৫১২০টি)।

প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

ক। কবি শিবরাম ঘোষ

সন ১৩৪৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কবি শিবরাম ঘোষের কালিকামঙ্গলের একখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খণ্ডিত পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। পুঁথির ভণিতা হইতে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ। মাতার নাম রাধিকা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করেন (রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভণে)। ইহা ছাড়া ঐ পুঁথি হইতে কবির আর কোন পরিচয় বা তাঁহার কাব্য রচনার কাল জানা যায় না। ইহার পর আমরা শিবরাম ঘোষ নামাঙ্কিত এক কবির একখানি একাদশী পাঁচালির পুঁথি পাই। রাজা চন্দ্রকেতু ও রুক্মাঙ্গদ নৃপতির দুইটি কাহিনী লইয়া পাঁচালিটি রচিত। পুঁথিখানি আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কালিকামঙ্গলের কবি শিবরাম ঘোষ এবং একাদশী পাঁচালি-রচয়িতা শিবরাম ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি। একাদশী পাঁচালির বন্দনাংশ হইতে আমরা কবির মাতার নাম সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারি এবং তাঁহার কাব্য-রচনার স্থান ও কাল জানিতে পারি।

ব্যাস বাল্মীকি আদি বন্দো যত কবি। জনক জননী বন্দো লোটাইয়া ভুবি ॥
বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ রাধিকা জননী। মহাগুরু দুইজন বন্দো পুটপাণি ॥
... ...
শশী শূন্য রস অগ্নি শকের বৎসর। পাতসা অরং সাহা ডিল্লি ঈশ্বর ॥
তমলিপ্ত মহাস্থান বন্দো দেবতা বাসুলি। তথাএ রচিল এই ব্রতের পাঁচালি ॥
দৈবকী নন্দন পদ ভজি একমনে। একাদশী ব্রতকথা শিবরাম ভণে ॥

অর্থাৎ ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি শিবরাম ঘোষ তাম্রলিপ্তে বসিয়া একাদশী পাঁচালি রচনা করেন। ইহা হইতে আমরা তাঁহার কালিকামঙ্গল রচনারও একটা আনুমানিক কাল সহজেই ধরিয়া লইতে পারি।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডে উক্ত উভয় পুঁথিই স্থানলাভ করিয়াছে (পৃষ্ঠা ৮৬২ ও ১০৪৫ দ্রষ্টব্য)। ডক্টর সেন প্রথমে কালিকামঙ্গলের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া অনুমান করেন, পরে একাদশী পাঁচালির পুঁথি দেখিয়া শেষোক্ত পুঁথির সঠিক রচনাকাল লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু প্রথমোক্ত পুঁথির রচনাকাল আর সংশোধিত হয় নাই। উক্ত ইতিহাসে কালিকামঙ্গল আলোচনায় কবির পিতামাতার নামোল্লেখ না থাকায় ইহার কবিকে একাদশী পাঁচালির কবি হইতে পৃথক মনে হইতে পারে।

ভবানন্দের হরিবংশ পুঁথির অন্যতম লিপিকর শিবরাম ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।[১]

১। ভবানন্দের হরিবংশ—সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত ভূমিকা পৃঃ ৵০ (১৩৩৯)

খ। 'বৈদ্য' ধর্ম্মদাসের একটি নূতন পাঁচালি

বাঙ্গালা ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যে আমরা দুইজন ধর্ম্মদাস কবির সাক্ষাৎ পাই। একজনের নিবাস বসরগ্রামে, তিনি জাতিতে বেনিয়া; আর একজনের নিবাস মান্দারণ, তিনি জাতিতে বৈদ্য। শেষোক্ত ধর্ম্মদাসই আমাদের আলোচ্য। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ডে) ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতা বৈদ্য ধর্ম্মদাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে (পৃষ্ঠা ১০৩৩ দ্রষ্টব্য)। আমরা সম্প্রতি তাঁহার একখানি সত্যনারায়ণ পাঁচালির পুঁথি পাইয়াছি, ইহাতে কবির পদবী জানা গিয়াছে। দু-ভাঁজ কাগজে ১৫ পাতা পুঁথির আকার ১৫"×৫"। খণ্ডিত হইলেও পুঁথির শেষ পৃষ্ঠা আছে—"ইতি সত্যনারায়ণ গ্রন্থ সমাপ্ত দক্ষিণ রায় ঠাকুরের মাড়য় বসিয়া বেলা দুই প্রহর সময় সমাপ্ত ইতি সন ১২৫৬ তারিখ ২৪ চৈত্র রোজ শুক্রবার এই পুস্তক শ্রীযুত প্রাণনাথ মণ্ডল নিজ বাটী করেন সাং পিছলদা পরগণে মঙ্গলঘাট সরকার মন্দারণ তালুকদার শ্রীযুত কাশীনাথ বিশ্বাস যথাদৃষ্ট তথা লিখিতং" ইত্যাদি। সত্রাজিৎ রাজা—সদাগর পুত্র মদনসুন্দর—ফাসিয়াড়া ও তৎকন্যা অম্বাবতীর কাহিনী লইয়া পাঁচালিটি রচিত।

ভণিতা—

পীরের পাঁচালি বন্দি ধর্ম্মসেন গায়॥
পীরের চরণতলে বন্দি ধর্ম্মদাসে বলে মনহর কল্যাম সুন্দর॥
কহে ধর্ম্মদাস সেন ভাবি নারায়ণ॥
ধর্ম্মদাস বলে প্রভু সত্যনারায়ণ। শত্রু বংশ ধ্বংস কর এই নিবেদন॥

রচনার নমুনা—

যাত্রা কৈল শুভ দেখি সাধুর নন্দন। শ্রীহরি বলিয়া সাধু চলে ততক্ষণ॥
নদনদী জঙ্গল সহর হয়্যা পার। কাশীপুরে উপনীত সাধুর কুমার॥
রামগড় দেবীপুর বামেতে রাখিয়া। কৃষ্ণপুর [গ্রা]মের দক্ষিণ দিগ দিয়া॥
মজলিষ উপনীত সাধুর কুঙর। হোথায় হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর॥
স্নান দান [করি] কৈল রন্ধন ভোজন। কর্পূর তাম্বুল খায়্যা করিল গমন॥…
সত্যপীর সাহেবের কদম ভাবিয়া। দিনে ষোল ক্রোশ সাধু যায় এড়াইয়া॥
কোন শঙ্কা নাহি সাধু পথ বাহি যায়! আসমানে বসে গাজি দেখিবারে পায়॥
আস্থানার তরে যায় মদনসুন্দর। লয়্যাছে তাহার পিছু ফাসিরার চর॥ ইত্যাদি

গ। দ্বিজ শঙ্করের গুরুদক্ষিণার রচনাকাল

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু নিবন্ধও রচিত হইয়াছিল দেখা যায়, যেমন গুরুদক্ষিণা, একাদশীর পাঁচালি ইত্যাদি। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য কিছু থাক্ বা নাই থাক্, এগুলি তদানীন্তন লোকমানসের পরিচয় বহন করে। প্রাচীন বাঙ্গালা

সাহিত্যে শঙ্কর, শঙ্করদাস বা দ্বিজ শঙ্কর-ভণিতায় গুরুদক্ষিণার পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়। ১১৬৯ সালে অনুলিখিত শঙ্করদাসের পুঁথির সহিত দ্বিজশঙ্করের পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি—একই রচনা (উভয় পুঁথিই মৎসংগ্রহে আছে)। দ্বিজশঙ্করের পুঁথির শেষাংশে আছে—

সারদা ভাবিয়া সঙ্কর করিল রচন। অন্তকালে চরণে রাখিবে নারায়ণ ॥
গুরুদক্ষিণা পুস্তক সাঙ্গ এই তক। করি তার বিবরণ শুন তার সক ॥
রস শশী ঋতু ইন্দ্র (ইন্দু ?) সকের লিখন। সখ লেখা করি বুঝ সুবুদ্ধি যে জন ॥
যেজন লিখন করে কর তারে দয়া। অন্তকালে গোবিন্দ দিবেন পদছায়া ॥
শুন শুন শিশুগণ গুরুর দক্ষিণা। গুরুকে দক্ষিণা দিয়া পুরহ কামনা ॥
এহাতে বৈমুখ তার বিদ্যা নাঞি হয়। শ্রীগুরুচরণে দ্বিজ সঙ্কর রচয় ॥

'ইন্দ্র' 'ইন্দু'র লিপিকর প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়। 'ইন্দ্র' অর্থে ১৪ গণনা করিলে শকাব্দ নির্ণয়ে বিপর্যয় ঘটে। আমাদের অনুমান সত্য হইলে দ্বিজশঙ্করের গুরুদক্ষিণার রচনাকাল ১৬১৬ শকাব্দ বা ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘ। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'আত্মপরিচয়'

বটতলার কল্যাণে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসানে'র (জাগরণ পালার) বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইং ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একটি উল্লেখযোগ্য সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয় অংশের পাঠ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (প্রথম খণ্ডে) একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয়ের একটি মূল্যবান পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তবুও একথা বিনয়ের সহিত নিবেদন করিব যে, বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া প্রকৃত পাঠনির্ণয়ের অবসর বোধ হয় এখনও আছে। প্রকাশিত ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয়ের দুই স্থলে কবির পৃষ্ঠপোষকরূপে 'শ্রীযুত আস্কর্ণ রায়ে'র নাম দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় তাঁহাকে ক্ষেত্রী বা রাজপুত বলিয়া অনুমান করেন। ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সঙ্কর মহাশয়ের বাড়ীতে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একটি ১১৯৭ সালের পুঁথি আছে। উহাতে উক্ত উভয়স্থানেই 'শ্রীযুত আস্কর্ণ রায়ে'র পরিবর্তে 'শ্রীযুত ভাস্কর রায়' পাঠ দেখিয়াছি। একখানি খণ্ডিত পুঁথিতেও অনুরূপ পাঠ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শেষোক্ত পাঠটির প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৬। নরোত্তমদাসের গুরুভক্তি চিন্তামণি

নরোত্তম দাস-ভণিতায় ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু নিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।[২] ইহার সবগুলিই বৈষ্ণব কবি নরোত্তমের রচনা কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর সংশয় আছে। নরোত্তম-ভক্ত বল্লভদাসের একটি পদে নরোত্তমের রচনার তালিকা পাওয়া যায়।[৩] আমরা সম্প্রতি নরোত্তম দাস-ভণিতাযুক্ত গুরুভক্তি চিন্তামণির একখানি পুঁথি পাইয়াছি। এই পুথির বিষয় কোথাও আলোচিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ভণিতা ও বিষয়বস্তু বিচার করিয়া ইহাকে আমরা ঠাকুর নরোত্তমের রচনা বলিয়াই মনে করি। ক্ষুদ্র পুঁথি, ১৩"×৪"; ভু-ভাঁজ কাগজে চারিটি পাতা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০।১২ পংক্তি করিয়া লেখা। পুষ্পিকা—"ইতি শ্রীগুরুভক্তি চিন্তামণি সম্পূর্ণ। সন ১২১৫ সাল তারিখ ১ আষাঢ় রোজ সোমবার পঠনার্থ শ্রীরামচন্দ্র দাস ফদিকার সাং কালিদহ স্বাক্ষর নিজ।" নরোত্তম কৃষ্ণের ন্যায় গুরুকেও ভজনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গুরুসেবা না করিয়া কৃষ্ণ-আরাধনা নিষ্ফল। বৈষ্ণব, গুরু ও কৃষ্ণপ্রেমই জীবের মুক্তিলাভের উপায়—ইহাই গুরুভক্তি চিন্তামণির বিষয়বস্তু।

গুরুতে করিয়া কৃষ্ণ করহ সাধন। তবে সে করিব দয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
গুরুসেবা ছাড়ি যেই অন্য দেব পূজে। বিধবার কপালে যৈছে সিন্দুর নাহি সাজে ॥…
গুরুসেবা হইলে ভাই কৃষ্ণসেবা হয়। গুরু রুষ্টে কৃষ্ণরুষ্ট জানিহ নিশ্চয় ॥…
মুঞি মূঢ়মতি গুরুসেবা না জানিনু। সংসার বিষয় রসে মজিয়া রহিনু ॥
গুরুদেবে ভক্তি করি ভজ কৃষ্ণরাধা। সংসার তরিতে কোন না হইব বাধা।…

আত্মনিন্দা প্রচার করিয়া নরোত্তম চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছেন—

মোর অপরাধ যত শুন সর্ব্বজন। জন্মাবধি লিখ যদি না যায় লিখন ॥
সংক্ষেপ করিয়া কিছু কহিনু বিচারি। পাতকের ডরে মুঞি চলিতে না পারি ॥…
পায় পায় অপরাধ দোষ কর ক্ষমা। দীন হীন মুঞি কিছু না জানি মহিমা ॥
মোরে কৃপা করহে রসিক ভক্তগণ। আর কৃপা কর মোরে রূপ সনাতন ॥…
রঘুনাথ ভট্ট আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীজীব গোসাঞি রাখোঁ মোর হৃদিমাঝ ॥
আমার অচার্য্য প্রভু চরণকমলে। হৃদয় তুলিয়া রাখোঁ মনের সাদরে ॥…
তোমা সভার কৃপাদৃষ্টে করিনু বিচার। যে লিখায় তাহা লিখি কৃপায় তোমার ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ ভালমন্দ কিছুই না জানি। লাজ বিজ খায়্যা তবু করি টানাটানি ॥…
শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞীর পদতলে করি আশ। যে কিছু লিখিনু যেন বালকের ভাষ ॥…
শ্রীলোকনাথ গোসাঞীর পদতলে করি আশ। শ্রীগুরুচিন্তামণি কহে নরোত্তম দাস ॥

২। The Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal (১৯৩০)—মণীন্দ্রমোহন বসু পৃঃ ২৯৬-৯৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১৩৫৫)—ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (১৩৪১)—জগবন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত পৃঃ ৩২০।

৬৮৮। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। শেষ পত্রের কিয়দংশ নাই। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৩ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণচরণ সহায় ॥
গদাপর্ব্ব লিখ্যতে।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
বিচারিয়া পাণ্ডব না পাইল দরশন ॥
আপনার শিবিরে গেলা ধর্ম্ম নরপতি।
দুর্য্যোধনতত্ত্বে চর গেলা শীঘ্রগতি ॥

শেষ—

আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
তুমি তারে মারিলে অন্যায় যুদ্ধ করি ॥
হেন ছার সভাতে বসিতে না জুয়ায়।
এত বলি রথে চড়ি দ্বারিকারে জায় ॥
নিন্দা করি ভীমেরে চলিলা হলধর।
একেশ্বর রথে······নগর ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা···সমান।
অবহেলে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান ॥
ইহা জানি শুন সভে না করিহ···।
কাশী কহে গদাপর্ব্ব হৈল সমাধা ॥

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্ত স্বয়ক্ষর শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষ সাকিম কোটা পরগনে আমিরপুর সন ১১৯৩ সাল তারিখ ২ জৈষ্টী এক প্রহর বেলাতে সমাপ্ত বার শনিবার···।

৬৮৯। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৬ সাল। আরম্ভ—

৶ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ
অথো গদাপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
মুনি বোলে শুন পরিক্ষিতের কোঙর।
পুনরপি জেই মতে হইল সমর ॥
গদাপর্ব্বকথা এই শুন সর্ব্বজন।
তার পর জেই যুদ্ধ কৈল দুর্য্যোধন ॥

শেষ—

এত বলি বলরাম দ্বারিকাতে জায়।
ক্রোধ করি চলিলেন বলদেব রায় ॥
নিন্দা করি ভীমেরে চলিলা হলধর।
রথে চড়ি গেলা রাম দ্বারিকা নগর ॥
··· ··· ···
দ্বিজগণপাদপদ্ম বন্দিয়ে মাথায়।
গদাপর্ব্ব সমাধান কাশীদাস কয় ॥

লিক্ষতে শ্রীভোলানাথ সেন সাকিম তেলাই চাকলে ভূসনা পরগনে মহিমসাহি খারিজা মজকুরি তালুকদার ॥ মোকাম বাঁসগাড়ার কাচারি বেলা দুই দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল সন ১২০৬ বারো স ছয় সাল ইতি ২৯ ফাল্গুন।

৬৯০। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক

পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৪ সাল। পুথির লেখক গদাপর্ব্বের পরবর্ত্তী সৌপ্তিক পর্ব্বের ঘটনাবলীও গদাপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।
অথো গদাপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
বিচারিয়া পাণ্ডব না পাইল দরশন ॥
আপুনি শিবিরে গেলা ধর্ম্ম নরপতি।
দুর্য্যোধনতত্ত্বে চর গেলা শীঘ্রগতি ॥

শেষ—

এত বলি শরীর তেজিল কুরুরায়।
তা দেখি তিন বীর কান্দে উভরায় ॥
প্রাণ গেল রাজার দেখিল তিন বীর।
কান্দিতে ২ হইল বিকল শরীর ॥
... ...
সকল আপদ খণ্ডে ভারথ শ্রবণে।
লোক নিস্তারিতে কাশীদাস বিরচনে ॥
ভক্তি ভাবে শুনে ইহা জেই স্বজনে।
গদাপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এইক্ষণে ॥

গদাপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥ সন ১২২৪ বার সও চৌবিস সাল মাহ আশ্বিনে ৮ রোজে রবিবারের মুষ্কার সমএ সমাপ্ত হইল॥ এ পুস্তক শ্রীরাধানাথ নিওগীর ॥...লিখিতং শ্রীরাধানাথ মিত্র।

—

৬৯১। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল। আরম্ভ—

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
শুনিবারে শ্রদ্ধা বড় হইল অন্তর ॥
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
জেরূপে সমর কৈল রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
বিচারিয়া পাণ্ডব না পাইল দরশন ॥
আপন শিবিরে গেল ধর্ম্মনরপতি।
দুর্য্যোধনতত্ত্বে চর গেলা শীঘ্রগতি ॥

শেষ—

এতেক বচনে ক্রোধ সম্বরিল রাম।
দুর্য্যোধনে প্রশংসিল অতি অনুপাম ॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলিল হলধর।
ধিক্ থাকুক ভীম তোমার জীবন বিফল ॥
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি গদাপর্ব্ব সংপূন্য হইল॥ লিখিতং শ্রীসিযুরাম গরা সাং পলাষজাদ॥ সন ১২২৮ সাল তারিখ ১২ শ্রাবণ॥

—

৬৯২। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। সমস্ত পত্রের ঊর্দ্ধ ও নিম্নাংশ কাটা। কিন্তু তাহাতে পুথির লেখা নষ্ট হয় নাই। পরিমাণ ১৪৸০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। পূর্ব্বের ৬৯০ সংখ্যক পুথির ন্যায় আলোচ্য পুথিতেও সৌপ্তিক পর্ব্বের ঘটনাসকল গদাপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আরম্ভ—

অথ গদাপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন।
বিচারি পাণ্ডব না পাইল দরশন ॥

আপন শিবিরে গেলা ধর্ম্ম নরপতি।
দুর্য্যোধনতত্বে চর গেলা শীঘ্রগতি ॥

শেষ—

দুর্য্যোধন চলি যায় ইন্দ্রের ভুবনে।
এথানে ধর্ম্মের পুত্র শোকে অচেতনে ॥
সকল আপদ খণ্ডে ভারথ শ্রবণে।
লোক নিস্তারিতে কাশীদাস বিরচনে ॥
ভক্তিভাব করিয়া শুনহ সর্ব্বনরে।
গদাপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এত দূরে ॥

ইতি সন ১২৪০ সাল তাং ২২ বাইসা বৈসাগ। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। এ গদাপর্ব্ব জে আদরসে লিখিলাম এহাতে পঞ্চ জনার সির হানা আছে তাহা মিথ্যা॥ ত লিখিয়াছি কারন জে সায় পয্যস্ত কোন কথা থাকীবেক ॥ তাহা কোন উল্বেক নাঞী এ জন্যে লিখা ॥

৬৯৩। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১১, সম্পূর্ণ। তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
শ্রীমহাভারথে গদাপর্ব্ব উচ্যতে।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
অন্বেষিয়া পাণ্ডব না পায় দরশন ॥
আপন শিবিরে গেলা ধর্ম্ম নরপতি।
দুর্য্যোধনতত্বে দুত গেল শীঘ্রগতি ॥

শেষ—

নিন্দা করি ভীমেরে চলিলা হলধর।
একেশ্বর চলি গেলা দ্বারিকা নগর ॥
শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্তং। পঠনার্থে শ্রীমাধবচন্দ্র রায় সাং দুন্দিপুর পরগনে বরদা জেলা হুগ্লি সন ১২৪৩ বার সর্ত্ত তেচল্লিষ সাল তারিখ ১৫ চৈত্রী বেলা এক প্রহরের মর্দ্ধে সমাপ্ত হইল জানিবেন ইতি শ্রীবিশ্বনাথ পঠকের পুথি।

৬৯৪। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৫ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥
অথ গদাপর্ব্ব লিখ্যতে ॥
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
সমরে পড়িল যদি কুরুসৈন্যগণ ॥
কি কর্ম্ম করিলা কহ পিতামহগণ।
কি করিলা দুর্য্যোধন আর তিন জন ॥
মুনি বলে শুন কহি রাজা জন্মেজয়।
সমরে হইল যদি কুরুবলক্ষয় ॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
অন্বেষিয়া পাণ্ডব না পায় দরশন ॥

শেষ—

নিন্দা করি ভীমেরে চলিলা হলধর।
একেশ্বর রথে গেলা দ্বারিকা নগর ॥
…　　…　　…
শ্লোকছন্দে বিরচিলা মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥
একান্ত হইয়া চিত্ত শুন সর্ব্বনরে।
গদাপর্ব্ব সমাপ্তি হইল এত দূরে ॥

৬৯৫। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১০॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

৭ অথ গদাপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

মুনি বোলে শুন পরিক্ষিতের কোঙর।
পুনরপি জেই মতে হইল সমর ॥
গদাপর্ব্বকথা এই শুন সর্ব্বজন।
তার পরে জেন যুদ্ধ কৈল দুর্য্যোধন ॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শেষ—

পুনরপি দেখয়ে দোহার বীরদাপ।
ভীমের অধিক দুর্য্যোধনের প্রতাপ ॥
দুই বীর তরুণ দারুণ নিকরুণ।
কেবা বলাধিক কেবা সমরে নিপুণ ॥

৬৯৬। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২, ৪-১০, ১২-১৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। লিপি অত্যন্ত অশুদ্ধ। পরিমাণ ১৩।০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

অথ গদাপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

মুনি বলে কহি গদাপর্ব্বের কথন।
একমনে শুন পরিক্ষিতের নন্দন ॥
জলেতে প্রবেশ কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
সলিলে প্রবেশ রাজা নাহি দরশন ॥

ভণিতা—

দ্বিজের চরণ করিয়া বন্দন
কাশী কহে সুধাধার ॥

শেষ—

গদা মারি উরত ভাঙ্গুক সত্বর।
তাহা বিনে নাহি মরে কুরুর ঈশ্বর ॥
উরু ভাঙ্গিয়া তবে মার মহাবল।
পূর্ব্বে জে প্রতিজ্ঞা কৈলে রাখহ সকল ॥

৬৯৭। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১১, ১৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। কতিপয় পত্রের কিয়দংশ না থাকায় এক পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১২ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৫ সাল।

৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥
গদাপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

দ্বৈপায়ন হ্রদেতে প্রবেশি দুর্য্যোধন।
বিচারিয়া পাণ্ডব না পাল্য দরশন ॥
আপন শিবিরে গেল ধর্ম্ম নরপতি।
কুরুপতি জলে প্রবেশিলা শীঘ্রগতি ॥

শেষ—

তবে সূর্য্য অস্ত গেল দিন অবসান।
এত দূরে গদাপর্ব্ব হৈল সমাধান ॥
জাহার জে শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন।
কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া রহিলা দুর্য্যোধন ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্তং ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীজগর্ন্নাথ সরকার সাঁপরাজ।... ইতি সন ১২০৫ সাল তাঃ ১৭ ফালগুন রোজ মঙ্গল বার। বেলা দস দণ্ড ॥

৬৯৮। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক

এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।
পদাপর্ব্ব আরম্ভ ॥

জন্মেজয় বলে তবে মুনি তপোধন।
তদন্তরে কি করিল পিতামহগণ ॥
রণেতে কাতর হয়া কুরু নরপাত।
কিরূপে কোথায় তেহ করিল বসতি ॥
বৈশম্পায়ন কহে শুন জন্মেজয়।
রণে পরাভব হয়া কৌরবতনয় ॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
অস্ত্র হাতে কাতর বেথিত হয়ে মন ॥

ভণিতা—

গদাপর্ব্বকথা এই সুধার সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

১০ম পত্রে গদাপর্ব্বের বিষয় শেষ হইয়াছে। লিপিকর সেখানে পুথি সমাপ্ত না করিয়া, সৌপ্তিক পর্ব্বের বিষয়ও গদাপর্ব্বের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ।

৬৯৯। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৫-১১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩॥০×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৫ম পত্রের আরম্ভ—

তোরে না মারিয়া ক্ষেমা নাহিক আমার।
হেন জানি পুন যুদ্ধ কর দুরাচার ॥
ই আদি অনেক নিন্দা করিল রাজন।
নারিল সহিতে তবে রাজা দুর্য্যোধন ॥

শেষ—

আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
তুমি তারে মারিলে অন্যায় যুদ্ধ করি ॥
হেন ছার সভাতে থাকিতে না জুআয়।
এত বলি রথে চড়ি দ্বারকাতে জায় ॥
…　　…　　…
শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

৭০০। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১২ সাল। আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।
অথ সৌতিপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
কোন জন কোন কর্ম্ম কৈল অতঃপর ॥
মুনি বলে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
অহঙ্কার করি বীর লাগিলা কহিতে ॥
…　　…　　…
এখনেহ সেনাপতি করহ আমারে।
আজি আমি পাণ্ডবে পাঠাব যমঘরে ॥

শেষ—

এইরূপে হইল সেই রজনী প্রভাত।
দশ দিগ প্রসন্ন হইল দিননাথ ॥
প্রাণভয়ে তিন জন তথা নাহি রয়।
চলিল নগরমুখে চঞ্চল হৃদয় ॥
…　　…　　…
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত।
এত দূরে সৌতিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

ইতি সৌতিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥ জথা দিষ্ট [ইত্যাদি]।…লিখিতং শ্রীরামনারায়ন চোধরি ॥ ইতি সন ১২১২ সাল তাঃ ২৪ মাঘ। সাঃ পাইকপাড়া ॥ রোজ মঙ্গলবার ॥

৭০১। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২০ সাল। আরম্ভ—

মহারাজা দুর্য্যোধন পড়ি গেল রণে।
তবে কিবা কর্ম্ম কৈলা বীর তিন জনে ॥
দুর্য্যোধন দেখি তিন বীরে।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা ধরণী উপরে ॥
উরুভঙ্গে পড়ি আছে রাজা দুর্য্যোধন।
দেখি তিন বীর তবে যুড়িল ক্রন্দন ॥

শেষ—

এত বলি দুর্য্যোধন করএ ক্রন্দন।
হরষ বিষাদে রাজা তেজিল জীবন ॥
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম [দাস] কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি সক্তিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল লিখিতং দোস নাস্তি লিখিতং শ্রীকানাই মাজী সাং বেলগড়া পাঠক শ্রীরামদাস ইতি সন ১২২০ সাল তাং ৬ ভাদ্র।

—

৭০২। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৫×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

অথ সৌপ্তিপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
কোন জন কোন কর্ম্ম কৈল অতঃপর ॥
মুনি বলে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
অহঙ্কার করি বীর লাগিল কহিতে ॥

শেষ—

এইরূপে হৈল সেই রজনী প্রভাত।
দশ দিগ প্রসন্ন হইল দিননাথ ॥
প্রাণভয়ে পলাইয়া জায় তিন জন।
চলিল নগরপথে চমকিত মন ॥
ভারত সৌতিক [পর্ব্ব] অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে অমৃত বচন ॥

সৌতিক পর্ব্বঃ সমাপ্তঃ।

—

৭০৩। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি, এক পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩॥০×৪৸০ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীহরী।
সৌক্তিপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

মহারাজা দুর্য্যোধন পড়িল ত রণে।
কৃপ কৃতবর্ম্মা অশ্বথামা তিন জনে ॥
দুর্য্যোধন রাজা দেখি ভূমির উপর।
উরুভঙ্গে গড়াগড়ি জায় নৃপবর ॥
রণভূমে পড়ি আছে রাজা দুর্য্যোধন।
দেখিআ ত তিন জন করএ ক্রন্দন ॥

শেষ—

পাণ্ডবের বিনাশ শুনিয়া দুর্য্যোধন।
মৃত শরীরে জেন পাইল জীবন ॥
ভীমের মরণ হৈল শুনিয়া শ্রবণে।
ধীরে ২ বলে পুন রাজা দুর্য্যোধনে ॥
পুন কহে মহাবীর দ্রোণের নন্দনে।
বিনাশিলে কেমনে পাণ্ডব…

—

৭০৪। মহাভারত—ঐষীকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক য় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা।

পরিমাণ ১৩|০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬৮ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ॥
অথ ঐষীকপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিলা ভাই পঞ্চ জন ॥
মুনি বলে অবধান কর নরনাথ।
এইমত হইল সেই রজনী প্রভাত ॥
গোবিন্দ সহিত পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
একত্র করিয়া সভে করেন বিচার ॥
হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্নের আইল সারথি।
হেট মুণ্ড শিরে হাথ দাণ্ডাইল ক্ষিতি ॥
দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত কুশল কারণ ॥
সারথি কহিল দেব কি কহিব আর।
সর্ব্ব সংহারিয়ে গেলা দ্রোণের কুমার ॥

শেষ—

হৃদয়ে গোবিন্দপদ বন্দিয়া হরিষে।
স্তুতি কৈল অশ্বত্থামা অশেষ বিশেষে ॥
নিবর্ত্ত হৈল জ্বালা গেলা দ্রোণসুত।
আপন শিবিরে গেলা হয়ে দুস্থচিত ॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
ঐষীকের উপাখ্যান কহিলাম তোমায় ॥
ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এইখানে।
স্ত্রীপর্ব্বের কথা সভে করহ শ্রবণে ॥
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি ঐশীক পর্ব্ব সমাপ্ত বেলা ৬ ছঅ দণ্ড সমএ শ্রীবেনিমাধব বসুকী সাকিম খালিআড়া রোজ রোবিবার ...ইতি সন ১২৬৮ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র।

৭০৫। মহাভারত—স্ত্রীপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৪ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥
অথ স্ত্রীপর্ব্ব লিক্ষতে।

বৈশম্পায়নমুখে　　শুনি রাজা কৌতুকে
　　জিজ্ঞাসা করিল জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হৈল　　জত ক্ষেত্রিগণ মৈল
　　পাণ্ডবের ঘুচিল সংশয় ॥
তবে কি করিল মুনি　　এবে কহ তাহা শুনি
　　কি কহিলা পাণ্ডুর কুমার।
আদ্যোপাস্ত জত কথা　　শুনিলে ঘুচিবে বেথা
　　নিবেদিয়ে চরণে তোমার ॥
দুর্য্যোধনবধ শুনি　　ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি
　　কেমনে ধরিল নিজ প্রাণ।
গান্ধারি পুত্রের শোকে　　কি কহিল পাণ্ডবকে
　　তাহা কহ মুনি মূর্ত্তিমান ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস বলে　　মুক্তি হইব অবহেলে
　　ভজ কৃষ্ণচন্দ্র অবিরত ॥

শেষ—

বৈশম্পায়ন বলে শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে অনেক বুঝান নারায়ণ ॥
তথাপি অঙ্গিকার না করিল নরপতি।
পুনর্ব্বার কহে কৃষ্ণ মধুর ভারতী ॥
ধর্ম্মপুত্র তুমি অহে ক্ষেমা দেহ মনে।
হস্তিনা নগর চল...... ॥

পুথি সমাপ্ত চবি[শ] পাতে হইল শ্রীগোপীমোহন সিংহ...ইতি সন ১২৩৪ সাল তারিখ ২৪ পৌষ সম্বার।

৭০৬। মহাভারত—নারীপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৭, কিন্তু ১ম পত্রের দুই পৃষ্ঠায় ১-২ সংখ্যা লিখিয়া

১-১৮ পত্র করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। লিপি-কাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

অথ নারিপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

জন্মেজয় বলে মুনি কহ অতঃপর।
কি কর্ম্ম করিল তবে অন্ধ নরবর ॥
কি করিলা গান্ধারী প্রভৃতি জত নারী।
কি করিলা পঞ্চ ভাই দ্রুপদকুমারী ॥
কিরূপেতে লৌহভীম করিয়া রচন।
কিরূপে করিলা ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণ ॥
ভীম পায়্যা কি করিলা অম্বিকানন্দন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন ॥

শেষ—

এইরূপে সর্ব্বজন জাহ্নবীর তীরে।
নানা কথা আলাপয় শোক নাশিবারে ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা সুধার সাগর।
একমনে শুনিলে নিষ্পাপ হয় নর ॥
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারথ পুরাণ ॥
কাশীরাম বিরচিল পাচালির মত।
এত দূরে নারীপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

৭০৭। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২২, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অবস্থা জীর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩।।০×৪।০ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১২০২ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ জন্মেজয়।
শান্তিপর্ব্ব পুণ্যকথা শুন মহাশয় ॥
জ্ঞাতির তর্পণ করি ভাগীরথীজলে।
শোকাকুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কূলে ॥
অশৌচান্তে কৈল রাজা শ্রাদ্ধ শান্তি দান।
গঙ্গাতীর ছাড়ি গৃহে না করিল গমন ॥
ভাগীরথীতীরে···উত্তম আলয়।
তথায় রহিলা যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
নারদ···ব্যাস কপিল আদি করি।
সভাই আইলা তপোবন পরিহরি ॥
জ্ঞাতিশোকে যুধিষ্ঠির জাইতে চাহে বনে।
বুঝাইতে আইলা জতেক মুনিগণে ॥

শেষ—

বিদুর বিহনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিরন্তর শোক চিন্তে নিরানন্দ মন ॥
শূন্য হৈল সংসার না চায় রাজ্যভার।
নিরন্তর কান্দে রাজা করে হাহাকার ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে হিত উপকার ॥
ইহার শ্রবণে জত সুখ লভে নর।
তাদৃশ নাহিক সুখ স্বর্গের উপর ॥
কাশীরাম দাস কহে পাচালীর মত।
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি শান্তিপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত ॥ সঅক্ষর শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ সাং ফুটীগোদা ॥ বেলা দেড় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল ইতি সন ১২·২ সাল তাং ৫ মাঘ শকাব্দ ১৭১৬ ॥

৭০৮। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৮, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৭ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি।

অত শান্তিপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

বন্দ মহামুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
পরাশরসুত সত্যবতীর নন্দন ॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
শান্তিপর্ব্বকথা পুণ্য শুন মহাশয় ॥
জ্ঞাতির তর্পণ করি ভাগীরথীজলে।
শোকাকুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কূলে ॥
অশৌচান্ত কৈল রাজা শ্রাদ্ধ শান্তি দান।
গঙ্গাতীর ছাড়ি গৃহে করিল পয়ান ॥
ভাগীরথীতীরে কৈল উত্তম আলয়।
তথাই রহিলা যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥

শেষ—

বিদুর বিহনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিরবধি শোক চিন্তা নিরানন্দ মন ॥
শূন্য হইল সংসার না ভায় রাজ্যভার।
নিরন্তর কান্দে রাজা করি হাহাকার ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার।
এহ লোকে পরলোকে হয় উপকার ॥
ইহার শ্রবণে জত সুখ লভে নর।
তাদৃশ নাহিক সুখ স্বর্গের উপর ।
কাশীরাম দাস কহে পাচালির মত।
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। এই পুস্তক শ্রীদীগাম্বর মজুমদার শাকীম পাচড়া সন ১২২৭ সাল তারিখ ৮ মাঘ বেলা তিন পোহরের সময় ॥ জেলা সেলেমাবাদ সামিল বর্দ্ধমান ॥ সাইদ শ্রীরামকমল মহমদা বাটী পাচড়া।

৭০৯। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৮৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷৹ × ৪৷৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুইখানি শান্তিপর্ব্বের পুথি অপেক্ষা আলোচ্য পুথিখানি বৃহদাকার ও নানা উপাখ্যানে পূর্ণ। প্রথম এক পঙ্‌ক্তির লেখা অস্পষ্ট। তাহার পরে আরম্ভ এই—

… … কি করিলা পিতামহগণ ॥
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈল পঞ্চ জন।
কিবা ধর্ম্ম উপার্জ্জিলা পালি প্রজাগণ ॥
শরশয্যায় রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
কি কারণে উত্রায়ণে তেজিল জীবন ॥
কিবা ধর্ম্ম যোগকথা [কৈল] যুধিষ্ঠিরে।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবে আমারে ॥

ভণিতা—

শান্তিপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস ইহা করিল রচন ॥

শেষ—

বিদুরে চাহিয়া তবে বৈলা নারায়ণ।
পাণ্ডবে তোমার প্রীতি জানে সর্ব্বজন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে যোগধর্ম্ম সদা শুনাইবে।
পাণ্ডবে সদয় মন হইয়া বুঝাবে ॥
সঞ্জয় চাহিয়া [তবে] বলে যদুপতি।
তুমি কৌরবের কুলে অন্ধের সারথি ॥
দিব্যজ্ঞান তোমারে দিলেন ব্যাস মুনি।
শুনাইবে ধর্ম্মরাজে ধর্ম্মের কাহিনী ॥
পরম আনন্দ সভে হস্তিনা নগরে।
শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এত দূরে ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ঘোষ। সাং রামপুর এ পুস্তক সমাপ্ত হইল ॥ তারিখ ১২ পৌষ ইতি সন ১২২৮ সাল।

৭১০। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিক পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা, কতিপয় পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তিও আছে। পুথির অবস্থা ও লিপি উত্তম। পরিমাণ ১৩৸৹ × ৪৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৮ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

অথ শান্তিপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
অতঃপর কি করিল পিতামহগণ ॥
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈল পঞ্চ জন।
কিবা ধর্ম্ম উপার্জ্জিল পালি প্রজাগণ ॥
শরশয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কি কারণে উত্রায়ণে তেজিল জীবন ॥
কিবা যোগধর্ম্ম কৈল রাজা যুধিষ্ঠিরে।
বিস্তার করিয়া মুনি কহিবে আমারে ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির সার।
একচিত্তে শুন ভবসিন্ধু হবে পার ॥

শেষ—

শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল তবে ক্ষেত্রিয় বিধানে।
নানা রত্ন আদি দান দিল দ্বিজগণে ॥
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল।
লিখনে না জায় কত ধেনু দান দিল ॥
অতুল দক্ষিণা দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণে।
শোকচিত্তে রহে রাজা হস্তিনা ভুবনে ॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনু অন্য নাই মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে ॥
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান।
এত দুরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান ॥

ইতি সান্তিপর্ব্ব সমাপ্তং ॥ লিখিতং শ্রীমথুরা-মোহন হাজরা। সাং গোপালপুর ॥ পুস্তক-মিদং শ্রীসনাতন পাল…পং চন্দ্রকোনা সন ১২৪৮ সাল তারিখ ২২ শ্রাবন বৃহস্পতি বার বেলা ৪ দণ্ড থাকিতে ॥ মোং শ্রীযুত বড় চক্রবর্ত্তীর মহাসএর দাবাদাবানি ১৵৹ এক টাকা দুই আনা।

৭১১। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৮, ৩০-৮৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩।৹ × ৪৷৹ ইঞ্চি। শেষ অংশও খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

অথ মহাভারথ শান্তিপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় বলেন বলহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল পিতামহগণ ॥
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈল পঞ্চ জন।
কিবা ধর্ম্ম উপার্জ্জিল পালি প্রজাগণ ॥
শরশয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কিরূপে উত্তরায়ণে ত্যজিলা জীবন ॥
কিবা যোগধর্ম্মকথা শুনিল পাণ্ডব।
বিস্তারিয়া কহ মুনি সেই কথা সব ॥

ভণিতা—

শান্তিপর্ব্ব ভারথের অপূর্ব্ব কথন।
একমনে একচিত্তে শুনে জেই জন ॥
তাহার শরীরে কভু পাপ নাহি রয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

৮৩ পত্রের শেষ—

কালরূপী ভগবান্ এক সনাতন।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সেই করান সৃজন ॥
সেইরূপ তোমার দেখিয়ে কুলক্ষণ।
প্রায় বুঝি কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ ॥

মায়াবতী মহামায়া অখিল মোহয়।
ঈশ্বরের মায়া জান বুঝিতে না রয়॥
মায়াতে করিয়া বন্দী যত জীবগণ।

৭১২। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১২-৪১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৪।০ ইঞ্চি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বাদশ পত্রের আরম্ভ—

নবধা বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন।
কি কারণে তাহা মন না করে সাধন॥
শুনহ গোবিন্দভক্তি কঠিন না হয়।
কি কারণে তাহা লোক মানে পরাজয়॥

ভণিতা—

মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

৪১ পত্রের শেষ—

ভীষ্ম বলে অবধান কর ধর্ম্মরায়।
আর কিছু পুণ্যকথা কহিয়ে তোমায়॥
গোবিন্দের মূর্ত্তি জেবা করে আরাধন।
নানা উপহার দিয়া করিব পূজন॥

৭১৩। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-২৬, ৩১-৬২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। লিপি অশুদ্ধ। কতিপয় পত্র কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৪।০ × ৫ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বিতীয় পত্রে—

দ্রোণ জিজ্ঞাসিল মোরে করিয়া বিশ্বাস।
শুন মুনি তাহাকে বলিলাম মিথ্যা ভাষ॥
কেমতে এ সব পাপে পাব পরিত্রাণ।
এ নহে ক্ষেত্রির ধর্ম্ম শুন মতিমান॥
... ...
তবে ব্যাসদেব বলে শুনহ রাজন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে হবে পাপের বিনাশ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস॥

ভণিতা—

কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

৬২ পত্রের শেষে—

পুত্রের বচন শুনি সম্বিত পাইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিল॥
শুভ সমাচার পুত্র কহিলে আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতীপুরে॥
সফল তপস্যা মোর হইল এত দিনে।
দেখিব পরমানন্দ অর্জ্জুন মিলনে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া শকতি।
সবান্ধবে দেখিব কৃষ্ণ গুণনিধি॥

৭১৪। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২, ৪-১৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীহরি॥
পাণ্ডববিজয় লিক্ষতে।

কৃষ্ণচন্দ্র নাহি দেখি আমার মন্দিরে।
চঞ্চল আমার চিত্ত তথির কারণে॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ভ্রাতৃগণ বলে।
মহামুনি ব্যাস তথা আইল সত্বরে॥
ব্যাস দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তার বন্দিল চরণ॥

জ্ঞাতিবধ পাপে মোর ভয় নিরন্তর।
কি উপায় করিব বলহ মুনিবর॥
তবে ব্যাস বলেন শুনহ রাজন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন এ তিন সংসার

৭১৫। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৫-১৬, ২৭-৩০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

এই ছয়টি পত্র ৭১৪ সংখ্যক পুথির পরবর্ত্তী অংশ। সুতরাং পৃথক্ উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

৭১৬। মহাভারত—আশ্রমিকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। কতিপয় পত্র কীটদষ্ট। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৭ সাল। আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

অথ আশ্রমপর্ব্ব লিক্ষতে॥
জন্মেজয় বলে অবধান কর মুনি।
তদন্তরে কি কর্ম্ম হইল কহ শুনি॥
পিতামহগণ কথা অপূর্ব্ব চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র॥
অশ্বমেধ যজ্ঞান্তরে পিতামহগণ।
কি কর্ম্ম করিলা কহ শুনি তপোধন॥
কি কর্ম্ম করিলা অন্ধ সুবলনন্দিনী।
নারীগণ কি করিলা কহ দেখি শুনি॥

শেষ—

এই মতে অন্ধরাজ তেজিলা জীবন।
শ্রাদ্ধ শান্তি সমাপিলা ভাই পঞ্চ জন॥
সুবলনন্দিনী কুন্তী বিদুর সঞ্জয়।
সকল হইল পুন স্বর্গেতে আলয়॥
আশ্রম পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইতি আশ্রম পর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীভিখারি সরকার সাকিম ঘোড়াইল সন ১২০৭ সাল তারিখ ৩২ জ্যৈষ্ঠী রোজ বৃহস্পতিবার ইতি।

৭১৭। মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৮ সাল। আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥

অথো আশ্চর্য্য পর্ব্ব লিক্ষতে॥
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
অতঃপর কি করিলা পিতামহগণ॥
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
আশ্চর্য্য পর্ব্বের কথা করহ শ্রবণ॥
বিদুর বলেন ধর্ম্ম কর অবধান।
সংসার তেজিব আমি যোগে দিব মন॥

শেষ—

তবে মুনিগণ গেলা জার জেই স্থানে।
সেই কালে গেলা ঘরে দেব নারায়ণে॥
ক্ষেত্রির বিধান লয়্যা ধর্ম্ম নরপতি।
দশ পিণ্ড দান দিল মুনির সংহতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরিয়ে ভববারি॥

মুনি বলে কুরুবর কর অবধান।
আশ্চর্য্যপর্ব্বের কথা এই সমাধান ॥
ইতি আশ্চর্য্যপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৮ সাল তাং ২৯ চোইত্রী।

৭১৮। মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল।

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।
অথ আশ্রমিক পর্ব্ব ॥
জন্মেজয় বলে অবধান মহামুনি।
তদন্তরে কি হইল কহ তাহা শুনি ॥
পিতামহ উপাখ্যান অদ্ভুত চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞান্তরে পিতামহগণ।
কি কর্ম্ম করিল তাহা কহ তপোধন ॥

শেষ—
তবে যুধিষ্ঠির রাজা বেদের বিধানে।
শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপিয়া দ্বিজে দেই দানে।
নানা রত্ন দেই দান না জায় লিখন।
ভাণ্ডার হইতে আনে প্রবাল কাঞ্চন ॥
হস্তী অশ্ব গাভী দিল দেশ আর গ্রাম।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র নাম ॥
... ...
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
এত দূরে আশ্রমিক পর্ব্ব জে সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২৪০ সাল তাং ৭ চৈত্রী।

৭১৯। মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পঞ্চম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা লিপিশূন্য এবং ষোড়শ পত্রের ২ পৃষ্ঠায় ৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫× সাল। আরম্ভ—

৭শ্রীশ্রীহরিঃ ॥
অথো আশ্রমপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
জন্মেজয় রাজা বলে শুন মহামুনি।
তদন্তরে কি কর্ম্ম হইল কহ শুনি ॥
পিতামহ উপাখ্যান অদ্ভুত চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইল পবিত্র ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞান্তরে পিতামহগণ।
কি কর্ম্ম করিল পুন কহ তপোধন ॥

শেষ—
তবে যুধিষ্ঠির রাজা [আনি] দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধ আদি সমাপিয়া দ্বিজে দিল দানে ॥
নানা রত্ন দিল দানে না জায় গণন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দ্বিজে দিল সর্ব্বধন ॥
হস্তী অশ্ব গাভী দেন দেশ আর গ্রাম।
পৃথিবী পূর্ণিত হৈল ধর্ম্মপুত্র নাম ॥
... ...
কাশীরাম দাস বিরচিল পাচালির মত।
এত দূরে আশ্রমপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥
ইতি আশ্রমিক পর্ব্ব সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি ১২৫× সাল তারিখ ২১ কার্ত্তিক। লেখদার শ্রীরামহরি দত্ত হংসেস্বর দত্ত সাং পানাগর ॥

৭২০। মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৫॥০ × ৫।০ ইঞ্চি। কয়েক পঙ্‌ক্তির অভাব-বশতঃ শেষ অংশ অসম্পূর্ণ। লিপিকাল

প্রভৃতি নাই। ৭১৮ ও ৭১৯ সংখ্যক পুথির সহিত আলোচ্য পুথির বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

৭২১। মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৫, ১২-১৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পত্র কীট-দষ্ট। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পঞ্চম পত্রের আরম্ভ—

যুধিষ্ঠির প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তার অনুমতি বিনে নারিব জাইতে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
সান্ত্বনাপূর্ব্বক ধর্ম্ম বিবিধ প্রকারে ॥

ভণিতা—

অপূর্ব্ব আশ্রমপর্ব্ব ভারত কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পঞ্চদশ পত্রে—

ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিনিত বিদুরের কৈল সমস্কার ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহিল সমাচার।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকাকুমার ॥

৭২২। মহাভারত—মৌষল পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি লিপিকাল ১২৬৮ সাল।

পুথির শেষে 'মৌষল পর্ব্ব' নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা মৌষল পর্ব্ব নহে। অশ্বত্থামার মণিহরণ, তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিক্ষিতের জীবনদান এবং কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রলোকে গিয়া অভিমন্যুর সঙ্গে অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার, ইহাই পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

হস্তিনাপুরেতে যবে বৈসে ধর্ম্মরায়।
পুত্রের অধিক করি পালিল প্রজায় ॥
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নরপতি।
নৃত্য গীত আনন্দিত নানা বাদ্য নিতি ॥
... ...
শুনিয়া দ্রুপদসুতা বিষাদিত মন।
পুত্র ভ্রাতৃশোকে দেবী করয়ে রোদন ॥

শেষ—

প্রবোধ পাইয়া পার্থ কৃষ্ণের সহিতে।
পুনরপি নিজপুরে আসি উপনীতে ॥
কহিল সকল কথা সভাকার স্থানে।
শুনিয়া সকল লোক সুখ পায় মনে ॥
... ...
কাশীরাম দাসের বাসনা এই মনে।
জন্মে ২ শুনি যেন ভারত কথনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
এত দূরে মৌষল পর্ব্ব হইল সমাধান ॥

ইতি সন ১২৬৮ সাল তারিখ ৩০ ভাদ্র এই পুস্তক শ্রীবলরাম নিওগীর সাং বেলীয়াতোড়।

৭২৩। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৮, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৸৹ × ৪৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৯ সাল।

প্রয়াণ ও স্বর্গারোহণ, এই দুই ভাগে পুথিখানি বিভক্ত। ৫ম পত্রে প্রয়াণ এবং ২৮ পত্রে স্বর্গারোহণ শেষ হইয়াছে।

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।